কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণীর কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবার পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত।

কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর ; শিক্ষাতত্ত্ব পরিক্রমা, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশান্তিরঞ্জন সান্যাল
স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য—ছয় টাকা তিরিশ পয়সা।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

বলেছেন যে আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য চাই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের যোগাযোগ স্থাপন এবং তা করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কর্ম অভিজ্ঞতা প্রদান করতে হবে।

কিন্তু কর্মশিক্ষার অর্থ আসলে কি? কমিশন কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে কর্মঅভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনানুগ উৎপাদনমূলক কর্ম ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রামীণ প্রয়োজনে উদ্ভুত শিল্প কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে নূতন করে শিল্পকাজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করে, তার অনুশীলন করাই বিধেয়। অর্থাৎ কর্ম অভিজ্ঞতা হবে ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনায় বিধৃত। উৎপাদনমূলক কর্মে যে ক্রমবর্ধমান জটিলতা দেখা যাচ্ছে, তার সমাধানের জন্য উন্নত ধরণের শিল্প বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে উচ্চতর বৌদ্ধিক ক্ষমতার প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই কর্ম অভিজ্ঞতা প্রদানের যে কোন পরিকল্পনার, উৎপাদনমূলক কাজের যে কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যোগাযোগ স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শুধু যে বিদ্যালয়ে কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তা নয়, তারা বিদ্যালয়ের সাথে সাথে গৃহে, কোনও কর্মপ্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, কিংবা যে কোন উৎপাদনমূলক কর্মে অংশ গ্রহণ করবে। এই কারণেই বিদ্যালয়ে সাধারণ শিল্প-শিক্ষা যতটা সম্ভব, ততখানির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছে, মানুষের বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজন যথা, অন্ন, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্য, অবসর বিনোদন, যানবাহন ইত্যাদি অত্যন্ত অর্থবহ। এ সবের প্রয়োজন যে ছাত্রছাত্রীদেরই, তা নয়। এ সব মৌলিক চাহিদাগুলি বিদ্যালয়ের, তথা ছাত্রছাত্রীদের এবং সমাজেরও বটে। অতএব ছাত্রছাত্রীদের যদি উৎপাদনমূলক কাজে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অভ্যস্ত হতে হয়, তাহলে তাদের সক্রিয়ভাব কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কমিশনও এর উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করার দিক থেকে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার অবদানের কথা স্মরণ করতে পারি। গান্ধীজী কর্মের ভিতর দিয়ে সামাজিক স্তরের

বিলোপ সাধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যার দোষেই হউক, তা হয় নি, কিন্তু তা বলে তার মূল্য নস্যাৎ করা যাবে না। বর্তমানে কমিশন কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনকে যেভাবে সুপারিশ করেছেন, তাতে সবাইকে কিছু না কিছু কাজ করতে শিখতেই হবে, তাহলেই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন স্তরের অবসান হবে এবং ছাত্রছাত্রী কর্মে উপযোগিতা লাভ করে সংসার রণাঙ্গনে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। শুধু তাই নয়, সকলেই যখন কাজ করতে শিখবে তখন সকলেই উৎপাদন করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা শুধু উৎপাদনই করবে না তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে শিখবে। শুধু তাই নয়, কর্ম ও সমাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপিত হবে। মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাবধান দূরীভূত হবে।

কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের নীতি বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভের সাথে সাথে উপার্জনও করবে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষোপকরণ তৈরি করে কিংবা অঞ্চল ও সহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে পঞ্চায়েত বা পৌর প্রশাসনের সাহায্য করে ছাত্ররা উপার্জনের পথে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উৎপাদনমূলক কাজ "করতে পারলে তা থেকে কিছুটা আয়ও হতে পারে" বলে বলেছেন এবং সেই আয়-এর বিভিন্ন অংশ কোন কোন তহবিলে জমা হবে তার একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে প্রথমে টাকাটা আসবে সরকারের কাছ থেকেই। কিছু উৎপাদন হবে ঠিকই কিন্তু কর্মশিক্ষা দিতে গিয়ে অপচয়ও কম হবে না। সাফাই কাজ, বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বিধানের দিক থেকে শ্রমদান যথেষ্টই হবে এবং তার মূল্যমানও মোটামুটি কম হবে না। কিন্তু নানা কাজে যথা, কাগজের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ. সুতো কাটা, ইত্যাদি কাজে কাঁচামালের অপচয় ঘটবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা এসব কাজ করবে, অতএব অপচয়ও ধীরে ধীরে কমে আসবে। কিন্তু ক্রমে উৎপাদিত জিনিসের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সেগুলোর বিক্রয় ব্যবস্থা করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে না। সে যাহোক ছাত্রছাত্রীরা কাজে দক্ষতা অর্জন করলে তার একটি ব্যবস্থা হবেই। অতএব আশা করা যাচ্ছে উত্তরকালে বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে আয়ের কিছু ব্যবস্থা হবেই,

তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা কাজ করতে গিয়ে সাবলীলতা ও দক্ষতা অর্জন করবে এবং তাদের উত্তর জীবন এই সব অভিজ্ঞতা সহায়ক হবে।

এই পুস্তকে কর্মশিক্ষা, ও সমাজসেবাকে একত্র করা হয়েছে। এবং সমাজসেবার সাথে যুক্ত করা হয়েছে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পালনীয় কাজ সমাজসেবা ও বিদ্যালয়ে পালনীয় কাজও কর্মশিক্ষার ধরনেরই কাজ। এ সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েও কুশলতা ও শারীরিক দক্ষতা অর্জন করা যায়।

কর্মশিক্ষার অংশটি বিভিন্ন বিষয় সিলেবাস ১নং পুস্তকে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে সিলেবাস ২নং পুস্তকে কিছুটা সংযোজন ও কিছুটা বিয়োজন করা হয়েছে। সব বিষয়গুলি নিয়ে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে, তার ইঙ্গিত এ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। তবে একথা সত্যি যে বই পড়ে হাতের কাজ বা কর্মশিক্ষা সম্ভব নয়। তাই এখানে শুধু কাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। যাঁরা শেখাবেন, তাঁরা হাতে কলমে শিক্ষা দেবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। এখানে শুধু কর্মের ধারার কথাই বলা হয়েছে।

যাঁরা শিক্ষা দেবেন, তাঁরা নিজেরা কোথায় শিক্ষা পাবেন সে বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিভিন্ন পন্থার কথা ভাবছেন। কাজ খুব কঠিন নয়, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

ছাত্রছাত্রীরা কাজ করবার সময় একটি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে, সেটি হচ্ছে প্রতিদিন কাজের পর তারা কাজের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করবে। আর তারা হিসেব রাখবে কাজের জন্য কতটুকু কাঁচামাল তারা নিয়েছে তার কথা। এবং সেই কাঁচা মালের মূল্য কতটা তা তারা লিখে রাখবে। শিক্ষক এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, তাহলেই আর এলোমেলো কাজ হবে না। কর্ম সুষ্ঠু পথ ধরে চলবে। কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন কিভাবে হবে সে বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ভাবছেন, কিন্তু কর্মশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাজের ডায়েরী রাখা অত্যাবশ্যক, এ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক রচনায় আমি অনেকের কাছ থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি। বাণীপুর স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার শ্রীভগবান দাসগাঙ্গুলী, ও কারুশিল্প বিভাগের প্রাক্তন ইন্‌স্ট্রাকটার এবং আমার

সহকর্মী শ্রীনর্বেন্দুশেখর চৌধুরী এই পুস্তক রচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। বাণীপুর ২নং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ শ্রীমান নিমাই রায়, এম. এ. পিজিবিটি আমার প্রাক্তন ছাত্র। সে আমাকে পুস্তক রচনায় সাহায্য করেছেত বটেই, সে কিছু কিছু ছবিও এঁকে দিয়েছে। সরিষা ২নং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ আমার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী যতি, এম. এ (দর্শন) পিজিবিটি, বি, এড. (উৎকল), এম. এ (এডুকেশন) কলিকাতা এবং অপর প্রাক্তন ছাত্রী ঐ সংস্থারই অধ্যাপিকা শ্রীমতী শিবানী বসু, এম এস সি, পিজিবিটি এম-এড (গোরক্ষপুর) আমাকে এই পুস্তক রচনায় নানা উপদেশ দিয়েছেন। ঐ সংস্থারই কাতাই শিল্প বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপুরন্দর হাজরা ও এই পুস্তক রচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীশিক্ষায়তনের শিক্ষিকা আমার স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী সেনগুপ্তা, বি. এ. বি-এড, হোম সায়ান্স ট্রেণ্ড আমাকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অংশ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। আমার ছোট ভাগ্নে শ্রীঅরূপ সেন আমার সকল রচনাতেই তার কিছু বক্তব্য রাখে। তার কথাও আমি শুনেছি। শেষে আমি মডার্ণ কাটিং ও সেলাই শিক্ষা, প্রণীত শ্রী আই বি, দাস ও জনাব শেখ সামসুদ্দিন—এই পুস্তক থেকে সাহায্য পেয়েছি। সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

কর্মশিক্ষা

সমাজসেবা

বিদ্যালয়ে কর্মসম্পাদন

কর্মশিক্ষা

মাটির কাজ (Clay modelling)
ও প্ল্যাষ্টিসিনের কাজ (Work with Plasticine)

মাটির কাজ ও প্লাষ্টিসিনের সাহায্যে কাজ শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ বোধ হয়, শিশুরা প্রথমেই তাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটি দিয়ে খেলার নানারকম জিনিস তৈরি করতে অভ্যস্ত হয়। তাদের একটা feeling for the tactile form জাগ্রত হয়। কোন কোন শিশু-বিদ্যালয়ে মাটি দিয়ে কাজ না করিয়ে প্ল্যাষ্টিসিন (plasticine) দিয়ে কাজ করান হয়। প্ল্যাষ্টিসিনে কাজ করলেও ঠিক একই রকম অনুভূতি হয়। কিন্তু প্ল্যাষ্টিসিন অত্যন্ত দামী জিনিস। ঐ জিনিস দিয়ে কাজ সাধারণ মধ্যবিত্ত ও গরীব শিশুদের দিয়ে করান সম্ভবপর নয়। মাটি আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। অতএব মাটির সাহায্যে শিশুদের কর্ম অভিজ্ঞতা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মাটি এমনই একটি জিনিস যাকে অতি সহজেই রূপ (form) দেওয়া যায়। তাছাড়া মাটির plastictiy শিশুদের হাতে ও অঙ্গুলিগুলিতে একটি বিশেষ অনুভূতি জাগায়। সেই জন্য শিশুদের দিয়ে মাটির কাজ করালে তাদের যেমন জিনিসের যথাযথ রূপ সম্বন্ধে ধারনা দেওয়া হয়, তেমনি অপর দিকে মাটির স্পর্শে শিশুদের অসীম আনন্দ দেওয়া যায়। সুতরাং শিশুর কাজের মাধ্যম হিসাবে মাটির কাজ খুবই উপযুক্ত। তা ছাড়া আরও একটি দিক আছে। উপযুক্ত মাটি প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। বলতে গেলে এর জন্য কোন খরচা নেই। সুতরাং অন্যান্য কাজ, যথা—কার্ড বোর্ডের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদিতে অনেক খরচ লাগে (যদিও কাজগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়), সেই তুলনায় মাটির কাজে খুবই সামন্য খরচ, বলতে গেলে খরচ লাগেই না। এই কাজ ভাল করে ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে করালে বহু সামাজিক প্রয়োজন মেটান চলে।

মাটি—সব চাইতে উপযুক্ত মাটি হচ্ছে এঁটেল মাটি। এই মাটি আঠার

মত। তবে অনেক কাজ বেলে মাটিতেও চলতে পারে। সাধারণতঃ যেখানে পুকুর কাটান হয়, সেখানে গভীর গর্তে যে মাটি পাওয়া যায়, সেই মাটি মাটির কাজের পক্ষে খুব উপযুক্ত। তবে স্থানীয় কুমোরদের কাছ থেকেও জেনে নেওয়া যায়, কোথায় কাজের উপযুক্ত ভাল মাটি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভিজে কাদা মাটি তুলে কাজ না করাই ভাল। প্রথমে মাটি তুলে কিছুদিন শুকোতে দিতে হয়। তারপর সেই শুকনো মাটিকে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। সেই গুঁড়ান মাটি থেকে কাঁকড়, ইটের টুকরো, ঘাস ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে। তারপর সেই মাটিতে জল দিয়ে মাখতে হবে, যেমনি করে ময়দা মাখা হয়। খুব ভাল করে বার বার ঠাসতে হবে। পা দিয়েও ঠাসা যায়। তবে এসব দরকার পোড়ামাটির কাজের জন্য। প্রাথমিক স্তরের মাটির কাজের জন্য মাটির এরূপ treatment বা cure এর দরকার নেই। তাদের জন্য মাটি তুলেই কাজ করান চলতে পারে। তবে কয়েক ফোঁটা Permanganate of potash বা Dettol দিয়ে মাটি নির্দোষ করে নেওয়া ভাল। কাজের মাটি কোনও damp ঘরে বা ভিজে চট দিয়ে ঢেকে রেখে দিলে সে মাটি সব সময় কাজের উপযুক্ত থাকে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যসূচীতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাটির কাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একাজ আরম্ভ করতে হয় প্রথম শ্রেণী থেকেই। অতএব ষষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের Recapitulatory theory অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কাজের স্তর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে পেরিয়ে যেতে হবে।

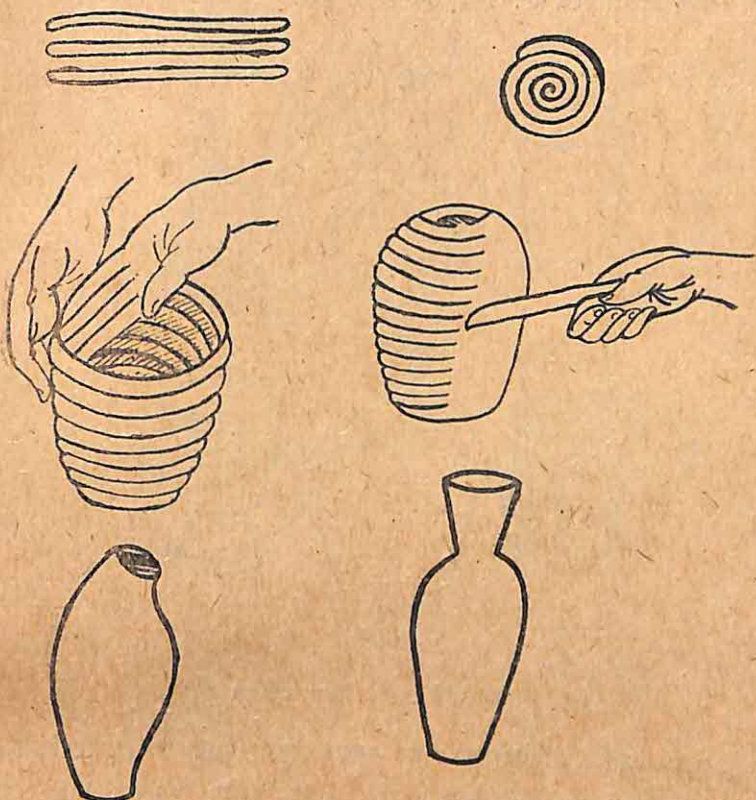
ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে মাটি দিয়ে নানারকম তরিতরকারি, ফল, গোল্লা, পাটা, পুতা ইত্যাদি তৈরি করবে।

তারপর তারা ছবি দেখে দেখে মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি তৈরি করতে শিখবে। এসব কাজে তারা প্রথমে দক্ষতা দেখাতে পারবে না, কিন্তু যে কোনো রূপ বা form দিতে চেষ্টা করবে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের অঙ্গুলিসঞ্চালনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাটি দিয়ে ভাল জিনস তৈরি করতে শিখবে।

এর পরের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কাজ। এখানে Coiled Pottery ও Slab Pottery শেখান যেতে পারে।

জড়ান বা কুণ্ডলীকৃত মাটির জিনিস (coiled pottery)

মাটির লেচি তৈরি করে লেচিগুলিকে এমনি coil করে রাখা যায়।



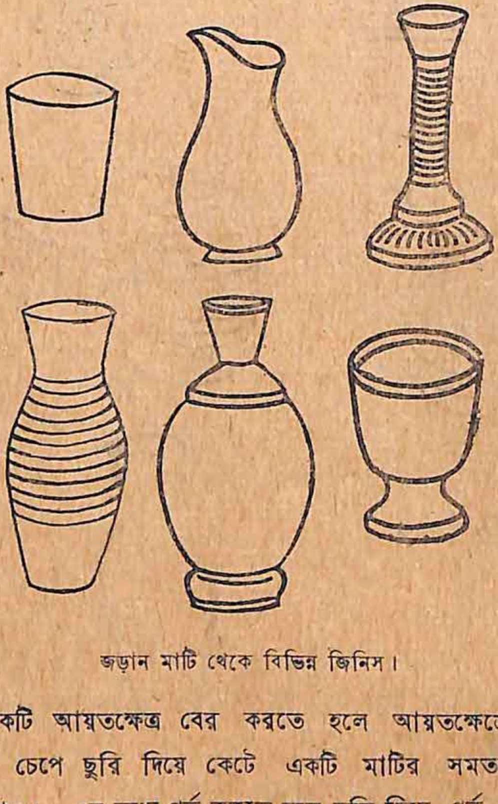
জড়ান কুণ্ডলীকৃত মাটির জিনিসের ক্রমবিন্যাস

এ থেকে নানা জিনিস তৈরি করা সম্ভব। উপরের ছবিগুলি দেখেই বুঝতে পারবে কি করে লেচিগুলিকে কুণ্ডলীকৃত করা হয়েছে এবং তা থেকে জিনিস তৈরি হচ্ছে। কুণ্ডলী দিয়ে যে কোন একটি পাত্রের আকৃতি গড়া গেল। তারপর বাঁশের পাতের ছুরি ব্যবহার করে ছবির মত করে কেটে, পরে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত কর।

আর কয়েকটি ছবি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল, যে গুলি অনায়াসে কুণ্ডলীকৃত মাটির লেচি থেকে তৈরি করা যায়।

মাটির পাতের উপর নির্ভর করে মাটির জিনিস (Slab pottery)

কাপড়ের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী পুরু করে মাটি ছড়িয়ে মাটি সমতল কর। প্রয়োজন হলে বাঁশের ছুরি ব্যবহার কর। (পরের পৃষ্ঠা দেখ)

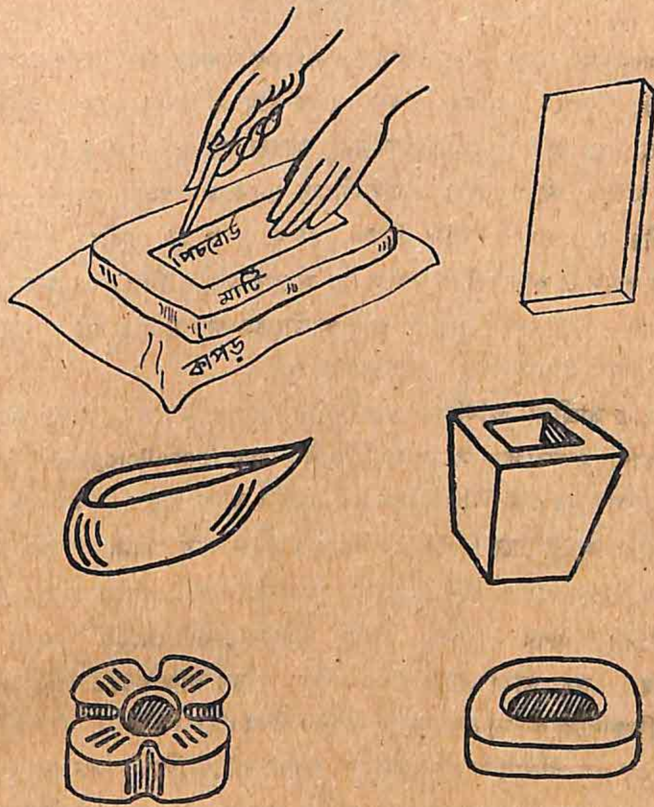


জড়ান মাটি থেকে বিভিন্ন জিনিস।

পরে একটি আয়তক্ষেত্র বের করতে হলে আয়তক্ষেত্রের পেষ্টবোর্ড তার উপর চেপে ছুরি দিয়ে কেটে একটি মাটির সমতল আয়তক্ষেত্র বের করে নাও। এর মধ্যে গর্ত করতে হলে ছুরি দিয়ে গর্ত কর। বিভিন্ন পাত জোড়া দিতে হলে জোড়া দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে জোড়া দিয়ে পালিশ করে দাও। Slab pottery থেকে কত রকমের জিনিস করা যেতে পারে তা ছবি থেকে দেখে নাও। slab গুলিকে সুন্দর নকশা করে নেওয়া যায়।

Coiled ও Slab Pottery তে কোন চাক লাগে না; কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে যথেষ্ট সুন্দর জিনিস তৈরি করা যেতে পারে। ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই এসব কাজ করবে। ঐ মাটির কাজ গুলি যদি ছায়াতে শুকিয়ে পরে কুমোরদের কাছ থেকে পুড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে।

এই ভাবে ছোট ইটও তৈরি করে পুড়িয়ে নেওয়া যায় ও সেগুলি দিয়ে ছোট খাট বাড়ী মেরামতির কাজও হতে পারে।



মাটির পাত থেকে তৈরি জিনিস

১৩+থেকে ১৫+বয়সের ছাত্র ছাত্রীরা মাটি দিয়ে মানুষ ও জীবজন্তু, ছবি দেখে বা life থেকে মাটির কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবে। এই বয়সে এদের জন্য চাক (Potter's wheel) দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি করান যেতো পারে। অবশ্য চাকে কাজ করতে হলে মাটির কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞত থাকতে হবে। মাটির তাল চাকে নিক্ষেপ করতে হলে যথেষ্ট অভ্যাস দরকার। তা না হলে পাত্রটি বাঁকা হয়ে যাবে।

কাগজের কাজ

মধ্যশিক্ষা পর্যদের তালিকাতে কাগজের কাজের কথা লিখিত আছে। আমরা এখানে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র ধরে কাগজের কাজ ধরে নিচ্ছি। কাগজ নিয়ে কাজ ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা আরম্ভ করতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারও আগে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের ৬ থেকে ৮ বৎসর বয়সের মধ্যে এ জাতীয় কাজ করা উচিত ছিল। সে যা হোক, ষষ্ঠ শ্রেণীতে অর্থাৎ ১২ বছর বয়সে এ কাজ আরম্ভ করলে এর আগের স্তরের কিছু কাজ করে নেওয়া উচিত। এসব কাজে শিশুরা হয়ত বাড়ীতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাহলেও এসব কাজে ইঙ্গিত এখানে একটু দেওয়া হচ্ছে।

ছাত্র ছাত্রীরা প্রাথমিক স্তরে কাগজ ভাঁজ করবে। তারা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, আয়তক্ষেত্র, সামন্তরিক রৈখিক ক্ষেত্র (parallelogram), সমবাহু অসমকোণী চতুর্ভুজ (Rhombus)– এগুলি ভাঁজ করবে। তারপর তারা অকেজো কাগজ দিয়ে (waste paper) ভাঁজ করে নানা জিনিস তৈরি করবে, যেনন গাধার টুপি, নৌকা, জাহাজ, প্যাণ্ট, কোট, বন্দুক, দোয়াত ইত্যাদি। এসব বিষয় তারা ছোট বেলা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে আছে। তবু তারা এসব কাজ করবে, কারণ কাজ করতে গিয়ে হাতের অঙ্গুলিগুলিকে জড়তা থেকে মুক্ত করাই বিশেষ প্রয়োজন।

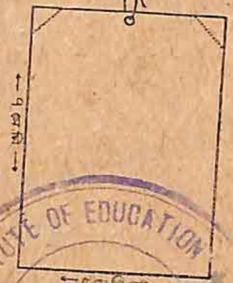
এর পর আসবে কাগজ কাটা। কাগজ কাটতে গিয়েও অকেজো কাগজের উপর কর্মশক্তি প্রয়োগ করে কর্মে অভ্যস্ত হতে হবে। তারা বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট কাগজের ভাঁজের মতই কাগজ কাটবে। তারপর তারা রঙিন কাগজ কাটার কাজ করবে। এর সঙ্গে তারা সৌন্দর্যবর্ধক (decorative designs) কাজ করবে। কাগজ চার ভাঁজ করে কোণাগুলি কাটলে এবং আরও ভাঁজ করে কোণা কাটলে, বা ভিতরে ছিদ্র করে ভাল করে কাটলে পরে কাগজটা খুলে সেখানে দেখা যায় খুব সুন্দর decorative designs হয়েছে। ছিদ্রগুলির নির্দিষ্ট দূরত্বের অবস্থান অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি নয়নানন্দজনক হবে বৈকি ?

এত গেল কাগজের কাজে প্রস্তুতির কথা। এবার ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী করে কাগজ কাটার কাজ যথাসম্ভব করতে হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের

কাগজ কাটা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সৃজনাত্মক। উৎপাদনমূলক কোন কাজের ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যখন সৃজনাত্মক কাজে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি জড়তা মুক্ত হয়েছে সেই অবস্থায় তারা যদি কিছু প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক কাজ করে তাহলে খুব ভাল হয়।

১। ছাত্রছাত্রীরা জিনিস-পত্রের মার্কা দেবার জন্য লেবেল (label) তৈরি করতে পারে।

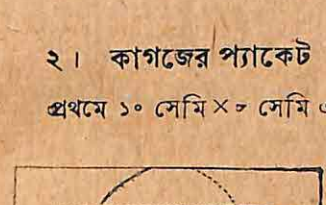
সেঞ্চুরিবোর্ড বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। ঐ বোর্ড থেকে ৭ সেমি × ৫ সেমি কেটে নিয়ে উপরের দিকে কোণা থেকে ১ সেমি করে কেটে নিলে লেবেলটি দেখতে সুন্দর হবে। উপরের দিকে অর্থাৎ ৫ সেমির মাঝখানে পাঞ্চ (punch) যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে টোয়ায়িন সুতো লাগিয়ে দেওয়া যায়।



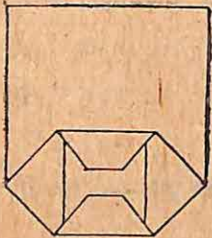
লেবেল

২। কাগজের প্যাকেট

প্রথমে ১০ সেমি × ৮ সেমি একটি কাগজ কাটতে হবে। পরে উপরের ৮ সেমি থেকে ২ সেমি করে কোণ থেকে দাগ দিতে হবে। উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ২ সেমি করে দুদিকেই দাগ দিতে হবে। নীচের দিক থেকেও ১ সেমি করে নকশার মত করে দাগ দিতে হবে। এবার উপরের ২ সেমি ও নীচের ১ সেমি কেটে নাও। পরে উপর থেকে নীচে দাগ অনুযায়ী ভাঁজ কর। এবার নীচের দিকে আঠা জুড়ে দিলেই সুন্দর ছোট প্যাকেট করবার মত জিনিস হল।


কাগজের প্যাকেটের নক্শা

৩। ঠোঙা

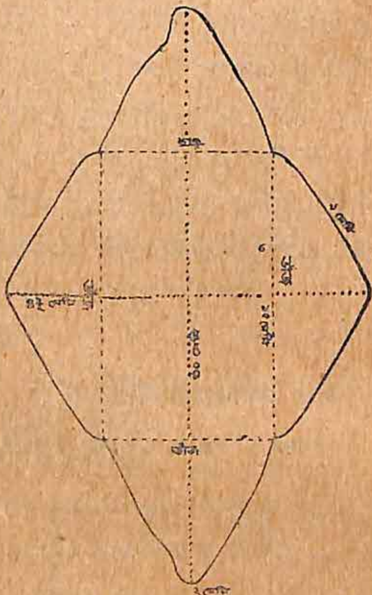


ঠোঙা

নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী খবরের কাগজে বা অকেজো কাগজ কেটে নিয়ে দুপাশে জুড়ে দাও। এবার গোল একটি জিনিস হল। দুপাশে চাপ দিয়ে ভাঁজ করে, নীচের দিকে ছবির মত ভাঁজ করে, আঠা লাগিয়ে দাও। শুকোলে দেখবে ঠোঙা তৈরি হল।

৪। খাম তৈরি

একটি খামের মাপ ও আকৃতি দেওয়া হল। এই মাপ অনুযায়ী কাগজ কেটে খাম তৈরি কর।



খামের নক্শা

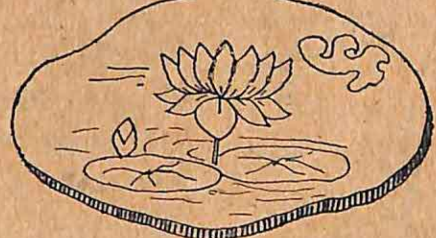
৫। মার্বেল কাগজ তৈরী

মার্বেল কাগজ তৈরি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এই দুর্দিনের বাজারে খাতার খুব দাম। সাধারণ খাতা বা বাঁধান খাতা সবই ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করে নিতে পারে। নানারকম সহজ উপায়ে মার্বেল কাগজ তৈরি করা যায়।

(ক) **এ্যালুমিনিয়ম পেণ্ট দ্বারা**—একটি বড় পাত্রে জল রেখে, তার

উপর যদি বিভিন্ন রঙের এ্যালুমিনিয়ম পেন্ট কাঠিতে করে ছিটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে রঙগুলি জলের উপর ভাসবে। কাঠি দিয়ে রঙের দানাগুলি ভেঙে দিয়ে তার ওপর সাদা কাগজ চাপিয়ে দাও, পরে তুলে দেখা যাবে কাগজটিতে বিচিত্র রঙের সমাবেশ হয়েছে, এটার কোন ছবি দেওয়া হল না। তোমরা নিজেরা কর, দেখবে অত্যন্ত আনন্দজনক অভিজ্ঞতা তোমাদের হবে।

(খ) আলুর ছাপের সাহায্যে—বড় আলু মাঝামাঝি ধারাল ছুরি দ্বারা কেটে নাও, দেখো যেন ভিতরটা বাঁকা না হয়। পরিস্কার সমতল আলুতে নানারকম খোদাই করে দাও। (ছবি দেখ)

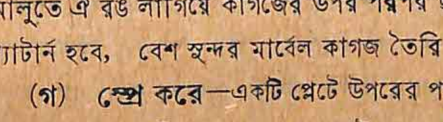


আলুর ছাপ

এবার একটি প্লেটে রঙ গুলে, গদের আঠা মিলিয়ে দাও। তারপর আলুতে ঐ রঙ লাগিয়ে কাগজের উপর পরপর ছাপ দিয়ে দাও। দেখবে একটা প্যাটার্ন হবে, বেশ সুন্দর মার্বেল কাগজ তৈরি হবে।

(গ) স্প্রে করে—একটি প্লেটে উপরের পদ্ধতিতে রঙ গুলে, ফেলে দেওয়া টুথ ব্রাস তাতে ডুবিয়ে সাদা কাগজের উপর একটি কাঠি দিয়ে ব্রাসটার উপর টান, যাতে রঙ ছিটিয়ে কাগজের উপর পড়ে। বিভিন্ন রঙের এরূপ সমাবেশ হলে মার্বেল কাগজ সুন্দর হবে।

(ঘ) নিজের নামের আ দ্য ক্ষ র দি য়ে—ধরা যাক্ তোমার নাম বিধুভূষণ মুখার্জি। তুমি একটি কাগজে এক সেন্টিমিটার প্রস্থে নামের আদ্যক্ষর পর্যায়ক্রমে লিখে যাও, দেখবে, কেমন সুন্দর প্যাটার্ন হবে।

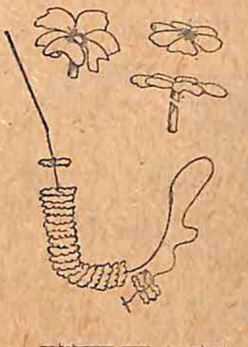


নামের আদ্যক্ষর প্যাটার্ন

৬। খাতা বাঁধাই

যে জাতীয় মার্বেল কাগজ তৈরী হল, সেই কাগজ, 'কভার' হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ ভাবে কাগজের ভিতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় সেলাই করে খাতা তৈরি করা যায়। (বাঁধান খাতার সেক্‌শন বাইণ্ডিং কার্ডবোর্ডের কাজের শিক্ষার অংশে শেখান হবে।)

৪। ক্রেপ কাগজের তৈরি ফুল ও মালা



কাগজের ফুল ও মালা

ফুলের রঙ অনুযায়ী রঙিন ক্রেপ কাগজ ছোট ছোট করে কেটে নাও। ধরা যাক শিউলি ফুল তৈরি হবে। ফুলের পাপড়িগুলির মত করে কাগজ কাট। এদিকে শিউলি ফুলের বোটার মত রঙের রঙিন একটু মোটা কাগজ কেটে গোল করে আঠা লাগাও। একটি বোঁটা, তারপর ফুলের পাপড়ি লাগিয়ে যাও। সুন্দর মালা তৈরি হবে।

বিঃ দ্রঃ এসব জিনিস ছাড়াও নানা ধরনের কাগজের কাজ হতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Papier mache-র কাজ। আমরা বিদ্যালয়ের কাজের অংশে মডেল ও রিলিফ ম্যাপ তৈরি করার কাজের কথা যখন বলব, তখন কাগজের মণ্ডের কথা আলোচনা করব।

কার্ডবোর্ডের কাজ

কাগজের কাজের সঙ্গে কার্ডবোর্ডের কাজের কিছুটা মিল রয়েছে, তাই কাগজের কাজের পরেই কার্ডবোর্ড সম্পর্কিত কাজের আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে।

কার্ডবোর্ডের কাজে যন্ত্রের তালিকা

বড় কাঁচি, ছুরি, বাটালি, ফোঁড়, মোটা সূচ (Binding needle), Try Square, ৩০ সে.মি. যুক্ত একটি স্কেল।

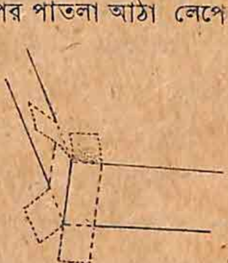
অন্যান্য উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, আঠা, কাগজ, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি।

প্রাথমিক অনুশীলন

কার্ডবোর্ডের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হলে বাটালির সাহায্যে পেষ্টবোর্ড কাটার কাজ ভাল করে শিখতে হবে। পেষ্টবোর্ডের একটি দাগের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভুল ভাবে বাটালি চালনা শিখতে হবে। পেষ্টবোর্ডের কাজে জ্যামিতিক রেখা নির্ভুল হওয়া প্রয়োজনীয়, তা না হলে কার্ডবোর্ড বা পেষ্টবোর্ড কাটা যদি আঁকাবাঁকা হয় তাহলে জিনিসটি খারাপ হয়ে যাবে। তাই অনুশীলনের জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সরু বা মোটা পেষ্টবোর্ডের উপর পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে তা বাটালি দিয়ে কাটতে হবে। দু ধরনের কাটা হবে, একটি হবে দাগের উপর দিয়ে পুরোপুরি কাটা, অপরটি হবে দাগের উপর দিয়ে অর্ধেক কাটা, যাতে ঐ অর্ধেক কাটা পেষ্টবোর্ডটিকে বরাবর আধাআধি ভাঁজ করিয়ে৯০° পর্যন্ত দাঁড় করান যায়। সাধারণতঃ পুরোপুরি কাটার জন্য পাতলা পেষ্টবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। আর অর্ধেক কাটার জন্য একটু মোটা বোর্ড ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। পাতলা বোর্ড কাঁচি দিয়েও পুরোপুরি কাটা যায়, কিন্তু কাঁচি দিয়ে ভাঁজ-করা বোর্ড কাটা যায় না।

আঠা লাগাবার নিয়ম

পেষ্টবোর্ডের উপর আঠা লাগাতে হলে কাগজের উপর পাতলা আঠা লেপে দিতে হবে। এমন ভাবে লেপতে হবে যাতে কাগজের উপর আঠার কোন গুটি না থাকে। পাশ থেকে নজর দিয়ে দেখতে হবে যেন আঠাসমস্ত জায়গায় লেপে গিয়েছে।


বোর্ড দাঁড় করান ও আঠা লাগান

পেষ্টবোর্ড সমকোণে দাঁড় করিয়ে জোড়া দিতে হলে একটু ঘন আঠার প্রয়োজন। আঠার কাগজটি লাগিয়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে পেষ্টবোর্ডের উপর সেটে দিতে হবে। আবার জোড়া লাগাবার সময় একটি কাগজের টুকরার মধ্যে আঠা লাগিয়ে দুদিক থেকে কাগজটি লাগিয়ে সেটা মাঝখানে উপরের ও নীচের দিকটা কেটে ভিতরে বসিয়ে দিতে হবে।

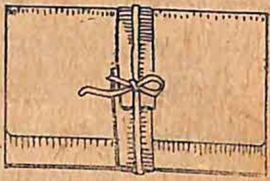
ছবি দেখ।

এবার কয়েকটি জিনিস তৈরি করবার পদ্ধতি দেখ।

১। **ফ্ল্যাট ফাইল** (Fiat Flle)

উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, সেমি স্কেল, কাগজ, শিরিষ কাগজ, আঠা, ফিতা।

পদ্ধতি—৩৫ সেমি×২৫ সেমি মাপে একটি পেষ্ট বোর্ড কেটে নাও। শিরিষ কাগজের টুকরা দিয়ে কাটাবোর্ডের টুকরার ধারগুলি সমান করে নাও। এবার কাটাবোর্ডের দুদিকে সাদা বা ব্রাউন কাগজে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। কোণাগুলিতে কাগজ মাঝামাঝি কেটে উলটে বোর্ডে



ফ্ল্যাট ফাইল

লাগিয়ে দাও। বোর্ডের মাঝে ৫৫ সেমি×৭ সেমি একটুকরা কাপড়ে উপরে নীচে আঠা দিয়ে কাগজ লাগিয়ে দাও। পেছনটা আঠা দিয়ে লাগান থাকবে, উপরটা থাকবে Flap হিসেবে। পরে কিনার থেকে মাঝামাঝি জায়গায় ৩সেমি দূয়ে ১ সেমি বাটালি দিয়ে ফোঁড় চলিয়ে ২ সেমি ফিতা প্রবেশ করিয়ে দাও। File এর উপরের দিক দিয়ে ফিতা বসান হবে এবং উলটে সেটাকে আনা হবে সম্মুখের দিকে। শুকোলে পরে Flat File টি কাজের উপযুক্ত হবে।

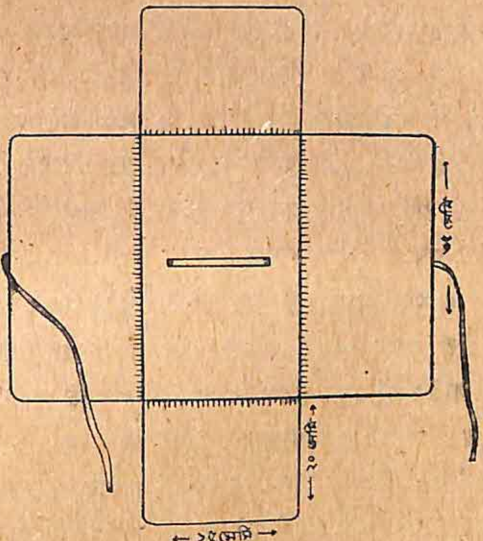
২। **কভার ফাইল** (Covered File)

উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, কাগজ, মোটা হিন্দুস্থান কভার পেপার, শিরিষ কাগজ, আঠা, ফিতা।

যন্ত্র—বাটালি, সেন্টিমিটার স্কেল, ট্রাইস্কোয়ার, কাঁচি।

পদ্ধতি—৩৫ সেমি×২৫ সেমি মাপে একটি পোষ্টবোর্ড কাট। শিরিষ কাগজ দিয়ে চারধার পরিস্কার করতে হবে। পেষ্টবোর্ডের দুদিকে সাদা বা রঙিন পাতলা কাগজ বা ব্রাউন পেপার লাগিয়ে দাও। এরপর হিন্দুস্থান কভার পেপার থেকে ৩৫ সেমি×২০সেমি ও ২৫ সেমি×২৫ সেমি করে প্রত্যেকটি ২খণ্ড করে কেটে নাও। ৩৫ সেমি×২০ সেমি দুটি খণ্ড কাগজ লম্বার দিকে পরস্পর বিপরীত দিকে আঠা লাগিয়ে সম্মুখ দিকে ভাঁজ করে দাও। এইরূপে চওড়ার দিকে ২৫সেমি×২৫ সেমি হিন্দুস্থান কভার কাগজ বিপরীত দিক থেকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে সম্মুখ দিকে ভাঁজ কর। প্রত্যেকটি কাগজ পিছনের দিকে ৫ সেমি করে আঠা দিায় লাগান থাকবে। এবার

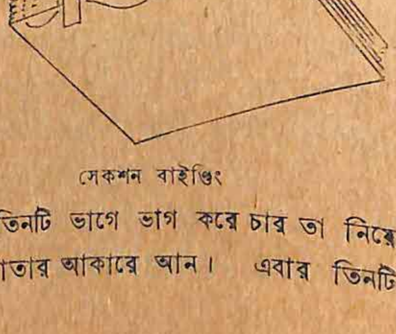
সাধারণ ফাইলের মত ফিতা লাগিয়ে দাও। পরে পিছনের দিকে প্রায় সমস্ত স্থানটি জুড়ে ব্রাউন পেপার বা সাদা কাগজ লাগিয়ে দাও।



কভার ফাইল

৩। **খাতা বাঁধাই**—সাধারণ খাতা বাঁধাই তোমরা জান। এবার উপরে পেষ্টবোর্ড দিয়ে কিভাবে Section binding করতে হয় তা দেখ।

উপকরণ—আধদিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ, দুখানা পেষ্টবোর্ড সাইজ ৭.৫ সেমি × ৬.৫ সেমি, বাঁধাই কাপড়ের (binding cloth) এর টুকরো ৭.৫ সেমি × ৩ সেমি, এই কাপড়েরই খুব ছোট টুকরো ২টি, সাইজ ২ × ১.৫ সেমি, কভার পেপার (যে মার্বেল পেপার তোমরা তৈরি করেছ), আঠা, সূচ (binding needle) সুতো, শিরিষ কাগজ।



সেকশন বাইণ্ডিং

পদ্ধতি—আধ দিস্তা কাগজকে তিনটি ভাগে ভাগ করে চার তা নিয়ে এক একটি ভাঁজ করে একসারসাইজ খাতার আকারে আন। এবার তিনটি

ভাগ খুব চেপে ধরে কিনারে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত দাগ দাও। এবার স্ঁচ দিয়ে প্রত্যেকটি ভাগের ভাঁজের নম্বরে গর্ত কর। প্রত্যেকটি ভাগের মাথায় পেন্সিল দিয়ে 'a' 'b' 'c' লেখ। এবার স্ূচে সূতা পরিয়ে বাহির দিক থেকে 'a' ভাগে ১নং দিয়ে স্ঁচ বাইরে থেকে পরিয়ে ২নং দিয়ে বের করে এনে ৩নং দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে ৪নং দিয়ে বের করে এনে ৫নং দিয়ে ঢুকিয়ে ৬নং দিয়ে বের করে আন। এবার 'b' ভাগটি বসিয়ে উপরের নিয়ম অনুযায়ী নীচে থেকে সেলাই কর। এবার সূতা যাবে ১নং এ। আবার ১নং থেকে একটা গিঁট দিয়ে সেলাই করতে করতে করতে ৬ নং-এ যাও। এখানে গিঁট দাও। ২ এবং ৩ ও ৪ এবং ৫ এর মধ্যে ছোট কাপড় দুটি ঢুকিয়ে দাও। তাতে সেলাই শক্ত হবে। এবার প্রথম ও শেষ কাগজে আঠা লাগিয়ে পেষ্টবোর্ড দুটি বসিয়ে দাও। পরে সেলাইর জায়গাতে বড় কাপড়ের টুকরোটি আঠা দিয়ে বসিয়ে দাও। কাপড়ের কিনারা গুলি থাকবে পেষ্টবোর্ডের উপর। এবার উপরে ও নীচে কাপড় একটু বাদ দিয়ে মার্বেল পেপার সাইজ করে লাগাও। পরে চাপ দিয়ে রাখ। শুকোলে কিনারাগুলি ধারাল ছুরি দিয়ে বাড়তি কাগজ কেটে পরে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ফেল। সুন্দর খাতা তৈরি হবে।

৪। **কাডবোর্ডের বাক্স** (ক) চতুষ্কোণ।

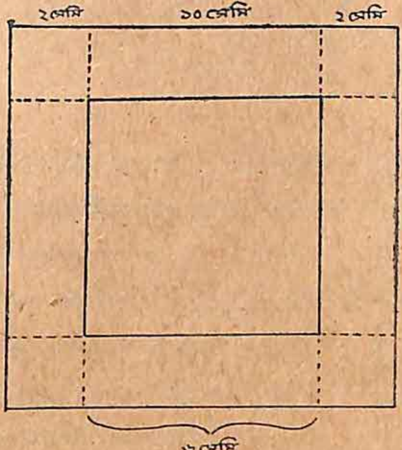
উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, কাগজ, আঠা, সেমি স্কেল।

যন্ত্র—বাটালি, কাঁচি।

পদ্ধতি—একটি পেষ্টবোর্ড থেকে ১০ সেমি × ১০ সেমি অংশ কেটে নাও। তারপর স্কেলের সাহায্যে প্রত্যেক দিকে ২ সেমি করে দাগ দাও। নক্শা দেখলেই বুঝতে পারবে। তারপর প্রত্যেকটি কোণের ২ সেমি × ২ সেমি জায়গা পর্যন্ত বাটলির সাহায্যে সম্পূর্ণ কেটে ফেল।

তারপর ভিতরের দাগগুলিতে বাটালি চালিয়ে আধা কেটে ফেল। এবার পেষ্টবোর্ডটি উল্টো করে কাটা ভাঁজ বরাবর একটু চাপ দিলে পর চারটি দিক দাঁড়িয়ে যাবে। কোণাগুলিতে সাদা ৩ সেমি চওড়া কাগজের চিট লাগিয়ে কোণায় কেটে জুড়ে দাও! কাগজের টুকরোগুলি ভিতরের দিকে যাবে, তবেই জোড়া শক্ত হবে। পরে ৫ সেমি চওড়া সাদা বা রঙিন কাগজ বরাবর চারপাশে লাগিয়ে যাও। কাগজের একটি অংশ ভিতরে

যাবে, অপর অংশ নিচের দিকে যাবে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক কোণায় কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে ভাঁজ করে আঠা লাগাতে হবে।



বাক্সের নক্‌শা

এবার বাক্সের নীচের অংশ তৈরি হল। উপরের অংশও ঠিক একই ভাবে তৈরি হবে। তবে পেষ্টবোর্ডের কোণে ২ সেমি করে দাগ না



তৈরি বাক্স

কেটে ১·৫নং সেমি করে কাটলে ও আগের মত করে জোড়া লাগিয়ে কাগজ কাটলে এটা নিচের বাক্সের উপরে ঠিক ভাবে বসে যাবে।

চতুষ্কোণ কার্ডবোর্ডের বাক্সের মত করে তোমরা যে কোন আকারের বাক্স তৈরি করতে পারবে।

(খ) **ছয়কোণা বাক্স :**

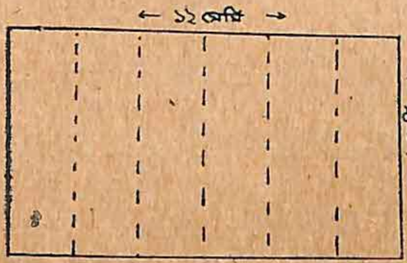
উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, আঠা, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি।

যন্ত্র—বাটালি, কাঁচি ইত্যাদি।

পদ্ধতি—১২ সেমি × ৬ সেমি একটি পোষ্টবোর্ডের টুকরো নাও।

তারপর ২ সেমির পর পর নকশার অনুরূপ দাগ দিয়ে নাও। এর পর বাটালি দিয়ে মাঝের পাঁচটি দাগের উপর দিয়ে অর্ধেক করে কেটে যাও। কাটার পর পেষ্টবোর্ডকে উলটে একটু একটু চাপ দিয়ে ভাঁজ করলে ছয় কোণো বাক্সের আকারে দাঁড়ালো। মুখ দুটো আঠা দিয়ে আগের মত জুড়ে দাও।

এবার আর একটি পেষ্টবোর্ড ১৩ সেমি × ২ সেমি এই মাপে কাট।
১৩ সেমিকে কেও ৬ ভাগ কর। এবার প্রত্যেকটি ভাগ হবেপ্রায় ২·২ সেমি।



ছয় কোণা বাক্সের নক্শা

আগের মত করে দাগের উপর বাটালি চালিয়ে সঠিক করে কেটে ভাঁজ করে মুখে জুড়ে দাও। এই অংশটি ছয়কোণা বাক্সের উপরের ঢাকনা।

এবার প্রথমটির নিচের একটি চতুষ্কোণ বোর্ড ও দ্বিতীয়টির উপরের জন্য চতুষ্কোণ বোর্ড লাগাও। বাক্সের কোণাগুলি যেন ঠিকভাবে থাকে সেদিক সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। শিরিষ আঠা লাগিয়ে জুটোর উপরেই ভারী বই বা আর কিছু চাপা দাও। কিছু পরেই ঢাকনাগুলো শক্ত হলে জুড়ে যাবে। পরে চতুষ্কোণ বোর্ডগুলি ছয়কোণা আর আকৃতি অনুযায়ী বাটালি দিয়ে বাড়তি অংশ কেটে ফেল। তারপর বাক্সটির দুটি অংশে রঙিন কাগজ বা সাদা কাগজ লাগাও। আঠা লাগাবার সময় দেখবে কোণাগুলি যেন কোনও ভাবে কুচকে না যায়। কাগজে আঠা সব জায়গায় সমানভাবে লাগলে আর কুচকে থাকবে না। কোণাগুলিতে কাগজ কোণাকুণি কেটে ভিতরে জুড়ে দিলে আর কুচকে থাকবে না। এর পরে তুমি ইচ্ছে করলে সোনালি বা রূপালি কাগজের টুকরো কেটে বাক্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পার।


ছয় কোণা বাক্স

(গ) গোল বাক্স

উপকরণ—পেষ্টবোর্ড, কাগজ, আঠা, শিরিষ আঠা, সূতো।

যন্ত্র—বাটালি ও কাঁচি।

পদ্ধতি—২১ সেমি×৬ সেমি এবং ২২ সেমি ×২ সেমি দুটি পেষ্টবোর্ড কাট। ১৯ সেমি পরিধি বিশিষ্ট একটি বাঁশের একটি টুকরো নাও। কিংবা অন্য কোন গোল টিনের কৌটা পেলেও নিতে পার। প্রথমে ২১ সেমি×৬×সেমি অংশটি একটু জলের ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে বাঁশে জড়াও। বাড়তি ২ সেমি অংশ একটি মুখের উপর কিছুটা জায়গা নিয়ে বসল। বাটালি দিয়ে মুখের দিকটা একটু ঘষে পাতলা করে শিরিষ আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। পরে সূতো দিয়ে চারদিকে ভাল করে বেঁধে দাও। এবার ২২সেমি×২ সেমি অংশটি জলের ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে আবার পেষ্টবোর্ডের উপরে সূতোর উপরে বসাও এবং মুল দুটো বাটালি দিয়ে পাতলা করে একটির উপরে আর একটি রেখে শিরিষ আঠা দিয়ে জুড়ে দাও এবং সূতো দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বেঁধে রাখ। পরদিন পেষ্টবোর্ডের গোল দুটি অংশই খুলে ফেল। পালিশ বাঁশ থেকে খুলতে কোনই অসুবিধা হবে না। দুটি অংশ পৃথক হয়ে গেল। এখন একটির উপরের ঢাকনা আর অপরটির নীচের ঢাকনা শিরিষ আঠার সাহায্যে চৌকো পেষ্টবোর্ড লাগিয়ে চাপ দিয়ে রাখ। নীচের ও উপরের বাড়তি অংশ বাটালি দিয়ে ভাল করে কেটে ফেল। এবার রঙিন বা সাদা কাগজ লাগাবার সময়। গোল জিনিসে লম্বা কাগজের strip কুচকে যেতে পারে, সেজন্য যেখানে বাঁকবে সেখানে কেটে কেটে কাগজটি বসিয়ে দাও। দেখবে উপরে ও নীচে জোড়ার উপর কাগজ লাগালেও কিছুটা জায়গা বাকী থেকে গেল। সেখানে সুন্দর গোল করে কাগজ কেটে কাগজ বসিয়ে দাও। Decoration এর জন্য সুন্দর করে সোনালি ও রূপালি কাগজ কেটে লাগাতে পার। সুন্দর পাউডার কেস হয়ে গেল।



গোল বাক্স

৫। **বটুয়া তৈরি**—গোল বা চৌকো বা ছয় কোণা বা পাঁচ কোনা পেষ্ট

বোর্ডের বাক্স বানিয়ে তার উপর ঠিক জড়ান যায় এবং উপরে ৮ সেমি ও নীচে ১ সেমি বেশি থাকে এমনি করে রঙিন বা ছিটের কাপড় কেটে ঐ



বটুয়া

বাক্সে বসিয়ে দাও! পাশে সেলাই কর। নীচের দিকটা কেটে নীচে আঠা দিয়ে লাগাও। পরে নীচে সাইজ করে কাগজ কেটে আঠা দিয়ে লাগাও। উপরে কাপড় ভাঁজ করে সেলাই করে ফিতা পরিয়ে দাও। পাশে সেলাই-এর দাগের উপর সোনালি বা রূপালি কাগজের টুকরা লাগাও। বটুয়া তৈরি হল।

৬। শিশির জন্য বোর্ডের কভার তৈরি।

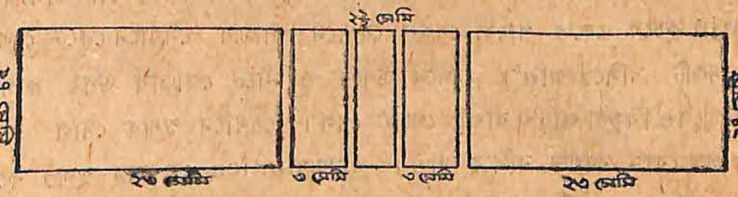
উপকরণ—সেক্সুরি বোর্ড, আঠা।

পদ্ধতি—একটি সেক্সুরি বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট মাপে বোর্ড কেটে, কাটা জায়গাগুলিতে কেটে, ভাঁজের জায়গাগুলি ভাঁজ করে, শেষের ছোট অংশ ভাঁজ করে আঠা লাগিয়ে দিলেই শিশির কভার হয়ে গেল। শিশির কভারের জন্য নিশ্চয়ই শিশির মাপ লাগবে। নীচের দিকেও আঠা লাগাতে হবে। দাঁতের মাজন প্যাক করা অংশে দেখ।

৭। এ্যালবাম তৈরি।

উপকরণ—২ পিস পেষ্টবোর্ড, প্রত্যেকটির সাইজ ২৩ সেমি × ১৮.৫ সেমি।
২ পিস পেষ্টবোর্ড প্রত্যেকটি ১৮.৫ সেমি × ৩ সেমি।
১ পিস পেষ্টবোর্ড ১৮.৫ সেমি × ২ সেমি।

ছিট কাপড়—একপিস ৬৫ সেমি × ২৫ সেমি। অপর পিস ১৮ সেমি × ৩ সেমি, মার্বেল কাগজ ২ পিস ২২ সেমি × ১৭ সেমি।



এ্যালবামের নকশা

আইলেট ৪টি, বো করবার জন্য কর্ড—৮০ সেমি, ভিতরের কালো কাগজ।
পেষ্ট বোর্ড গুলি উপরের মত করে সাজিয়ে বসাও।

প্রত্যেকটি অংশের পর ফাঁক দেওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে কাপড় লাগালে জায়গাটি সচল থাকবে। অর্থাৎ ভালভাবে ভাঁজ করা যাবে। এবার চারদিকে কাপড় লাগিয়ে দাও। বেশি কাপড় উল্টে গিয়ে বসবে। ভাল করে আঠা লাগাতে হবে, যাতে না কুচকে যায়। এবার অপর দিকে জোড়ার জায়গায় দ্বিতীয় কাপড় লাগিয়ে দাও। কভারের ভিতরে ফাঁকা জায়গায়, দুটি মার্বেল পেপার লাগাও। মার্বেল পেপার সম্পূর্ণ ঢাকবে না। কাপড় একটু দেখা যাবে।



এ্যালবাম

শুকোলে এ্যালবাম হল। এবার পাশের দিকে ছবি অনুযায়ী ২টি করে আইলেট লাগিয়ে দাও এবং তার মধ্য দিয়ে কর্ড পরিয়ে দাও। ভিতরের কালো কাগজ তোমার ইচ্ছানুযায়ী সিট কেটে বসাও। কর্ড তার মধ্য দিয়েও যাবে।

কাঠের কাজ

মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত কর্মশিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরের মধ্যে যে সব বিষয় আছে তার মধ্যে কাঠের কাজের উল্লেখ নেই, তবু এখানে কাঠের কাজ শিক্ষার কথা কেন আলোচিত হল, তার একটু কৈফিয়ৎ দরকার। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যসূচীতেও কাঠের কাজ অন্যতম মূল শিল্প কাজ। এই শিল্পকাজ যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি এর শিক্ষার ফলে সমাজের অনেক বাস্তব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তা ছাড়া কার্ডবোর্ডের কাজের সঙ্গে কাঠের কাজের অনেকটা মিল আছে, তাই কাঠের কাজ শিক্ষার কথা কার্ডবোর্ডের কাজের পরই আলোচনা করা হল। উভয় ক্ষেত্রেই সূক্ষ্মতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সামান্য ব্যতিক্রমও সম্পূর্ণ কাজটি নষ্ট করে ফেলতে পারে।

কাঠের কাজে যন্ত্রপাতি Centimetre Scale, Chisel $2\frac{1}{2}$ Cm, ICm, $\frac{1}{2}$Cm. Hand Saw 40 Cm, Tenon Saw, Try Square, Marking Gauge, Claw hammer, screw driver, Mallet, Iron plane, Rasp file, Iriangular file, Drill bits, Oil stone, and Carpenter's vice.

কাঠের কাজে প্রাথমিক উদ্যোগ—কাঠের কাজ করতে হলে প্রথমে চাই কাঠ ঠিক মাপ মত কাটা, তারপর কাঠ রেঁদা করা এবং সমকোণ করে কাঠগুলো স্থাপন করা। মনে রাখতে হবে রেঁদা করতে গিয়ে সমকোণ থেকে সামান্য বিচ্যুতি দেখা দিলেও উৎপাদিত জিনিসটি খারাপ হয়ে যাবে। প্রয়োজন বোধে কাঠটা গোল করবার জন্যও রেঁদা করতে হবে। তখন অবশ্য সমকোণের প্রয়োজন নেই।

১। Scale তৈরি : **উপকরণ**—সেগুণ কাঠ, শিরিষ কাগজ, পালিশ।

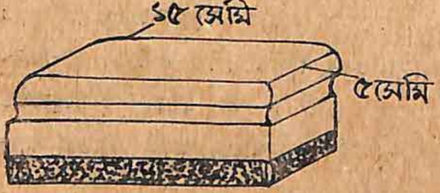
যন্ত্র—রেন্দা বা Iron plane, Try square, Marking Gauge।

পদ্ধতি—৩০ সেমি২·৫ × সেমি × ২·৪ সেমি মাপের একটি সেগুন কাঠের টুকরা Iron plane দিয়ে রেঁদা করে পরিষ্কার কর। লম্বালম্বি একদিকে ·৫ সেমি অংশ ঢালু করে প্লেন কর। শিরিষ কাগজ ঘসে পালিশ কর। পরে Try square এর সাহায্যে সেমি ও মিমি দাগগুলি কাট। এভাবে একটি ৩০ সেমি স্কেল তৈরি হল।

২। **ঝাড়ন বা** Duster,

উপকরণ—কাঠ [সেগুন বা হলুদ], শিরিষ কাগজ, শিরিষের আঠা ফেলটের কাপড়।

যন্ত্র—সেমি স্কেল, Try square, Marking gauge, Iron plane.



ঝাড়ন

পদ্ধতি—১৫ সেমি × ৫ সেমি × ৫ সেমি Try square, Iron plane ও marking gauge এর সাহায্যে plane কর ও সাইজ কর। ফেলটের কাপড় ১৫ সেমি × ৫ সেমি মাপে কেটে শিরিষের আঠা লাগিয়ে কাঠে জুড়ে দাও।

৩। **ম্যাপ কাঠি বা** Map pointer

উপকরণ—৬০ সেমি × ২ সেমি × ২ সেমি কাঠ, শিরিষ কাগজ।

যন্ত্র—Iron plane, scale,

পদ্ধতি—কাঠটি প্রথমে Iron plane চালিয়ে পালিশ কর, পরে একদিক সরু করে যাও। শিরিষ কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করে আরও পালিশ কর।

৪। **চকের বাক্স** (chalk box)—ঢাকনা ছাড়া

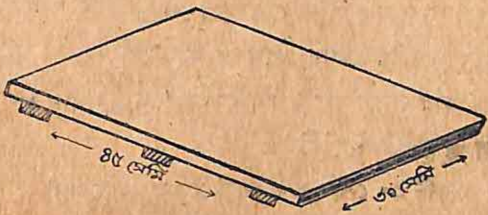
উপকরণ—কাঠ ৪৮ সেমি × ৪ সেমি × ১ সেমি, থ্রি পিস, প্লাইউড ১২ সেমি × ৪ সেমি, পেরেক ১ সেমি, পালিশ।

যন্ত্র—Iron plane, Try square, scale

পদ্ধতি—কাঠের টুকরাটি ভাল করে প্লেন করে marking gauge ও Try square এর সাহায্যে size কর। পরে এটি ১২ সেমি × ৪ সেমি করে ৪টি টুকরা কর। তারপর ·৫ সেমি পেরেক ঠুকে চারকোণা বাক্সের মত কর। পরে নীচে প্লাইউডের টুকরাটি পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দাও। এবার পালিশ কর।

৫। **পিড়ি তৈরি**

উপকরণ—একপিস কাঁঠাল কাঠ ৪৫ সেমি × ৩০ সেমি × ২ সেমি, ঐ



পিঁড়ি

কাঠ ৩০ সেমি × ৫ সেমি × ২ সেমি—তিন টুকরা, পেরেক ৩ সেমি।

যন্ত্র—করাত, Iron plane, হাতুড়ি।

পদ্ধতি—বড় কাঠ থেকে করাত দিয়ে ৪৫ সেমি × ৩০ সেমি × ২ সেমি এক টুকরা কাঠ কেটে নাও। আর ৩০ সেমি × ৫ সেমি × ২·৫ সেমি ৩ টুকরা কাঠ কাট। কাঠগুলি রেঁদা দিয়ে ভাল করে প্লেন কর ও সাইজ কর। তারপর তিন টুকরা কাঠ পর পর বসিয়ে উপরে তক্তা খানি বসাও, এবং ৩ সেমি পেরেক ৩ লাইন বসিয়ে দাও। পিড়ি তৈরি হল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হাতুড়ি ও পেরেকের সাহায্যে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করতে পারা যায়। যথা ডেস্ক, বাক্স ইত্যাদি সহজে তৈরি করতে পার।

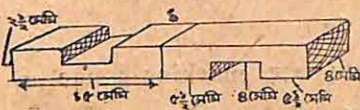
৬। **হাফ ল্যাপ জয়েন্ট তৈরী**

উপকরণ—সেগুন কাঠ ৩০ সেমি × ৪ সেমি × ২·৫ সেমি।

যন্ত্র—করাত, টেনন করাত, বাটালি, Iron plane, ম্যালেট।

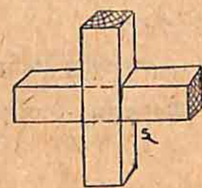
পদ্ধতি—৩০ সেমি × ৪ সেমি × ২·৫ সেমি সেগুন কাঠ করাত দিয়ে কেটে

নিয়ে ভাল করে Iron plane দিয়ে প্লেন করে সাইজ কর। পরে নক্‌শা অনুসারে দাগ দাও, প্রথমে ১৫সেমিতে দাগ দিয়ে পরে ফাঁকগুলি ৪সেমি করে।



হাফ ল্যাপের নকশা

দাগ দাও। সব দিকে দাগ দেওয়া হলে নক্‌শা অনুযায়ী ফাঁকগুলির জায়গায় marking gauge দিয়ে ২ সেমি দাগ দাও। ফাঁকগুলির হবে ৪ সেমি × ২ সেমি। এবার টেনন 'স' দিয়ে ফাঁকগুলি ছু দিক কাট॥ পরে বাটালি দিয়ে কাটা অংশগুলি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার কর। এবার ১৫ সেমির মাথায় দাগ অনুযায়ী টেনন স দিয়ে সোজাসুজি কাট। পরে গর্তগুলি মুখে মুখে জোড়া লাগাও। দেখবে একটির উপর আর একটি এঁটে



ক্রশ ল্যাফ

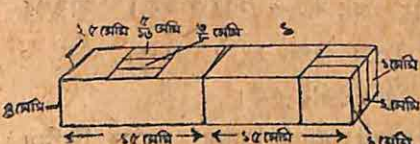
বসেছে। এবার হাফ ল্যাপ করার পর cross lap এ বসান হল।

৭। মটিস ও টেনন জয়েণ্ট

উপকরণ—একটি ৩০ সেমি × ৫ সেমি × ২·৫ সেমি কাঠ।

যন্ত্র—Try square, marking gauge, Iron plane, Tenon saw, স্কেল, chisel ২·৫ সেমি এবং ১ সেমি।

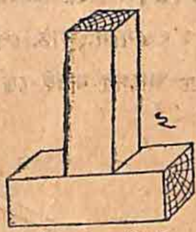
পদ্ধতি—কাঠটি বড় কাঠ থেকে সাইজ অনুযায়ী কেটে নাও, পরে ৩০ সেমি × ৫ সেমি × ২·৫ সেমি তে সাইজ কর। প্রয়োজন বোধে Try square ও marking gauge ব্যবহার কর। পরে নক্‌শার মাপ অনুযায়ী দাগ দাও।



হাফ ল্যাফের নকশা

পরে marking gauge দিয়ে প্রথম অংশে নকশার মাপ অনুযায়ী marking gauge দিয়ে দাগ দাও। বাইরের ছুটি অংশের মাপ হবে ১ সেমি করে ও মাঝের অংশ থাকবে ২ সেমি। দ্বিতীয় অংশে দাগ অনুযায়ী marking gauge দিয়ে দুটো বাইরের দিক ১ সেমি করে ও মাঝে ২ সেমি করে দাগ দাও। Tenon

অর্থাৎ আল করতে Tenon saw এর সাহায্যে তৈরি কর। mortise অর্থাৎ ছেঁদাটি ২.৫ সেমি বাটালি ও ১ সেমি বাটালির সাহায্যে কর। আলটি ছেঁদার মধ্যে ঢুকবে এমনি ভাবে কাজ কর। পরে নক্‌শার ১৫ সেমির মাথায় কেটে দু টুকরা করে আল ছেঁদার মধ্যে বসিয়ে দাও। দেখবে ঠিক বসে যাবে।



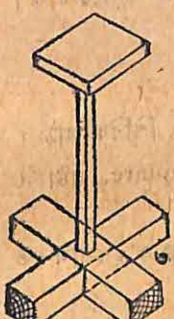
মার্টিস টেনন তৈরি

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তোমরা দু ধরনের জয়েন্ট শিখলে। Cross lap joint ও Mortise Tenon joint; এই দুটি joint শেখার ফলে তোমরা এখন নানা কাজ করতে পারবে।

৮। ল্যাম্প স্টাণ্ড

উপকরণ—cross lap joint এর মত একটি joint, তার সাথে যোগ কর ৭ সেমি × ৭ সেমি × ২.৫ সেমি ও ৩০ সেমি × ২.৫ সেমি × ১.৫ সেমি।



বাতিদান

Cross lap joint তৈরি করে ৭ সেমি × ৭ সেমি × ২.৫ সেমি কাঠের ছেঁদা কর। ৩০ সেমি × ২.৫ সেমি × ২.৫ সেমি উপরে নীচে cros lap joint এর মাঝে ছেঁদা কর। এবার কাঠটি উপরে ও নীচে ছেঁদার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। ম্যালেট দিয়ে ঠুকে দিলেই সুন্দর বাতি দান হয়ে গেল। Cross lap joint টি শুধু শিখলেই না, একটি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়ে গেল।

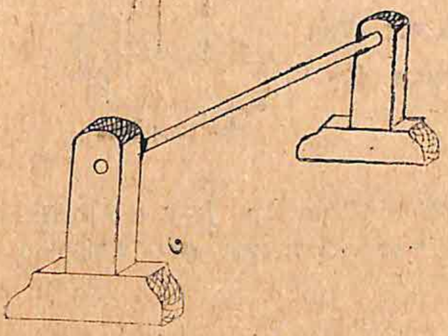
৯। ঘুটুনি বা churner—Cross lap joint থেকে অন্য আর একটি সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পার। নক্‌শার মত cross lap চারদিকে একটু খাঁজ কেটে দাও। পরে ভিতরে brace এর bit দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ছেঁদা করে এবং ৪০ সেমি × ২.৫ সেমি × ২.৫ সেমি কাঠ গোল গোল করে প্লেন করে নীচের দিকে আল করে ছেঁদা করে বসিয়ে দাও। প্রত্যেক বাড়ীতেই ডালের ঘুটুনি দরকার। সুন্দর ডালের ঘুটুনি হল।


ঘুটুনি

১০। Towel rack

উপকরণ—২টি mortise Tenon joint এর নমুনা। ৬৪ সেমি × ১˙৫ সেমি × ১˙৫ সেমি, কাঠ, পেরেক।

যন্ত্র—আগের মতই ছেঁদা করবার জন্য Brace bits।



টাওয়েল র‍্যাক

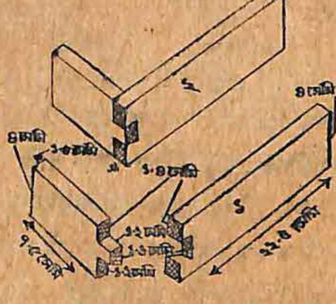
পদ্ধতি—নকশার মাপে ৬০ সেমি দূরত্বে দুটি Mortise ও Tenon joint স্থাপন কর। পরে ৬৪ সেমি থেকে ২ সেমি, ২ সেমি দুই দিক থেকে দাগ দিয়ে দাও। আল করে গোল কর। Mortise joint brace bit দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ছেঁদা কর এবং ঐ কাঠটি দুদিকে বসিয়ে দাও। সুন্দর একটি Towel rack হল।

১১। ডাভটেলড্ জয়েন্ট (Dovetailed joint)

উপকরণ—৩০সেমি × ৪৫সেমি × ১˙৫সেমি একটি সেগুন কাঠ, শিরিষ আঠা।

যন্ত্র—Hand saw, Tenon saw, Iron plane, Try square, বাটালি marking gauge.

পদ্ধতি—কাঠটিকে Plane করে Size করে ২২˙৫ সেমি এবং ৭˙৫ সেমি তে ভাগ কর। পরে marking gauge এর সাহায্য দুটোতেই কোণায় দাগ দাও। নকশার হিসেব মত দাগ দিয়ে Tenon saw ও বাটালির সাহায্যে ফাঁকগুলি পরিষ্কার কর। পরে একটির মধ্যে আর একটি বসিয়ে দাও। এবার শিরিষ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। দেখবে এ জোড়া আর খুলবে না। কারণ জোড়ার ছোট ফাঁক থেকে বড় কাঠ বের হয়ে আসবে না। আর শিরিষ আঠা লাগালে জোড়া শক্ত হবে।



ডাভটেলড্ জয়েন্টের নকশা

১২। পেন্সিল বাক্স

উপকরণ—উপরের মাপ অনুযায়ী দুটি Dovetailed joint এবং নীচের কভারের জন্য ২২˙৫ সেমি × ৭˙৫ সেমি প্লাইউড, উপরের ঢাকনা ২০ সেমি × ৫ সেমি × ১˙৪ সেমি, ১˙৫ পেরেক।

যন্ত্র—আগের মত।

পদ্ধতি—২টি Dovetailed joint এর সাথে আর দুইটি Dovetailed joint তৈরি কর এবং পরে পেরেক দিয়ে জোড়া লাগাও। নীচে ২২˙৫ সেমি × ৭˙৫ সেমি plywood এর টুকরাটি পেরেক দিয়ে লাগাও। পরে উপরের ঢাকনাটি সাইজ করে বাটামের কিনারে সরু খাঁজ কেটে ঠেলে লাগিয়ে দাও। ঢাকনা খোলার জন্য কাঠের উপর একটু গর্ত করে দাও।



পেন্সিল বাক্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য—Cross lap, Mortise Tenon ও Dovetailed joint কাঠের কাজের ভিত্তি স্বরূপ। এ কয়েকটি joint শিখলে কাঠের কাজের যে কোন জিনিস তৈরি সম্ভব। চেয়ার, টেবিল, আলনা, দরজার ফ্রেম ইত্যাদি সবই তৈরি করা যায়। তোমরা যদি আরও কিছু কাজ করতে চাও তাহলে মাপ জোগার করে তৈরি করে ফেল।

কাতাই শিল্প

কাতাইশিল্পের সংজ্ঞা—কাতাই শিল্প বলতে শুধু সূতোকাটাকে বোঝায় না। কার্পাস বীজ বপন থেকে আরম্ভ করে কার্পাস গাছ বৃদ্ধিকরণ, কার্পাস চয়ন, তার সংরক্ষণ, তুনাই, ধুনাই, পাঁজ তৈরি, সূতো কাটা, বস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কার্য প্রণালী হচ্ছে কাতাই শিল্পের অন্তর্গত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কাতাই শিল্পে কর্মের যে সব স্তরের কথা বলা হল, তা শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যক। এইসব স্তরের মধ্যে দিয়ে এই শিল্পটি শিক্ষা করা হলে ছাত্রছাত্রী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

নানা জাতের কার্পাস হয়, তবে স্কুলে বা বাড়ীতে লাগাবার জন্য জটা বা দেব কার্পাস, বুড়ি বা বামনি কার্পাস বীজ লাগান যেতে পারে। বুড়ি কার্পাস বেশ ভালো, কারণ এর আঁশগুলো বেশ লম্বা ও সরু সূতোর জন্য বিশেষ উপযোগী।

কার্পাস গাছের চাষের জন্য উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও জলের প্রয়োজন। জল যাতে গাছের গোড়ায় জমে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে



তূলার গাছ ও ফুল

হবে। কার্পাসের বীজ পরিষ্কার করে ২৪ ঘণ্টা গোবরের জলে ভিজিয়ে রেখে পরে ৮।১০ হাত অন্তর বীজ রোপন করতে হয়। তূলা উৎপন্ন হতে প্রায় ৬।৭ মাস সময় লাগে। কার্পাস ভাল করে পাকলে তুলতে হয়।

কার্পাস গাছে মাঝে মাঝে পোকার অত্যাচার হয়ে থাকে ফলে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। সকালের দিকে গাছের পাতায় ছাই ছড়িয়ে দিলে পোকা নষ্ট হয়। তামাকের জল দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

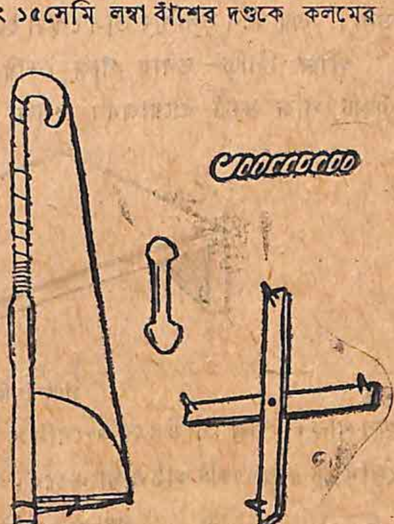
বীজ ছাড়ান—কার্পাস পাকলে গাছ থেকে তুলতে হয় এবং শুকিয়ে নিতে হয়। উপরের খোসা ফেলে দিলে বীজমুক্ত তুলা বের হয়। সাদা তূলাই সুতো কাটার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। বীজ ছাড়ানোর পূর্বে বীজযুক্ত তূলাগুলোকে রৌদ্রে বা উনানের পাশে রেখে গরম করে নিতে হয়। বীজ ছাড়ানোর জন্য ২০সেমি × ১০সেমি একটি পাটার প্রয়োজন। ঐ পাটার ছাউনিতে যে কাঠ লাগানো থাকবে তার আঁশগুলি যেন লম্বালম্বি না থেকে আড়াআড়ি ভাবে থাকে। বীজ ছড়াবার জন্য ১·৫ সেমি মোটা × ৩০সেমি

লম্বা একটি লোহার শিক নিয়ে সুবিধা মত ১টি হতে ৩টি বীজ সহ তূলার লাছি নিয়ে পাটার মাঝে রেখে শলাকা সমেত চাপ দিয়ে পাটার নীচের দিকে আনতে হয়। এর ফলে তূলার বীজগুলি উপরে উঠে যাবে এবং বীজ হীন তূলা পাটার উপর পড়ে থাকবে। বীজ ছাড়ানোর স্তর পার হলে তুনাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

তুনাই—তুনাই তিন প্রকার :—হস্ত তুনাই, ছুরি তুনাই, ধনুক তুনাই।

হস্ত তুনাই—কার্পাসের আঁশগুলি বীজ ছাড়াবার সময় পরস্পর জড়িয়ে যায়। এই তূলা থেকে সূতা কাটা অসুবিধা জনক বলে হাত দিয়ে আঁশ গুলিকে একমুখী করে নিতে হয়।

ছুরি তুনাই—৬ সেমি পরিধি এবং ১৫সেমি লম্বা বাঁশের দণ্ডকে কলমের মত কেটে ছুরি তৈরি করতে হবে। ছুরির ফলাটি হবে ৪সেমি, ধরবার স্থানটি হবে ৯সেমি। বীজ ছাড়ানো তূলা প্রথমে মাঝামাঝি ছিড়ে মাথাদুটি আঁশ অনুযায়ী একমুখী করে পুনরায় ওটিকে মাঝামাঝি ছিঁড়তে হবে। এরূপ প্রক্রিয়া দুতিনবার করার পর ডান হাত দিয়ে বাঁশের ছুরির সাহায্যে তূলাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাও। এরূপ তুনাই করে ১২ থেকে ১৫সেমি পর্যন্ত লম্বা করে পাঁজ পিড়ির উপর রেখে পাঁজ কাঠির সাহায্যে পাঁজ কর।



পিঞ্জন গুটিলা সূতোর গুণ্ডি ও নাটাই

ধনুক তুনাই—ছোট ধনুকের সাহায্যে তূলার আঁশগুলিকে খুলবার প্রক্রিয়াকে ধনুক তুনাই বলা হয়। ছুরি তুনাই থেকে এই ধনুক তুনাই বেশি কার্যকর। ৩০সেমি লম্বা ও ১.৫ সেমি চওড়া একটি বাঁশের খণ্ডকে ভালভাবে চেঁছে দুদিকে সরু সূতার একটি ছিলে পরিয়ে ধনুক তৈরি করতে হয়।

ধুনাই—ধুনাই করবার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন :

(১) **আসন** (২) **পিঞ্জন** ও (৩) **গুটিলা**।

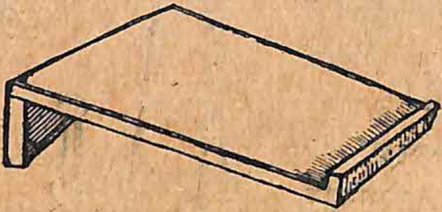
আসন তুলাকে ময়লামুক্ত করবার জন্য শরকাঠি বা বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি আসন দরকার। আসনের উপরে রেখে ধুনাই করতে হয়, তাহলে তুলার ময়লাগুলি নীচে পড়ে যাবে।

পিঞ্জন—পিঞ্জন তিন প্রকারের :—বড়, মধ্যম ও যুদ্ধ পিঞ্জন। সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রীরা যুদ্ধ পিঞ্জন ব্যবস্থায় করে থাক। পিঞ্জন প্রায় ৮০সেমি থেকে৯০ সেমি লম্বা হয় এবং ওজন হয় প্রায় ৭৩০ গ্রাম থেকে ৮৫০ গ্রাম।

গুটিলা—১৫সেমি লম্বা ৪সেমি × ৪সেমি। দুদিকে দুটি মুট থাকে তা বর্তুলাকার।

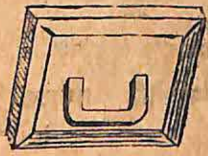
গুটিলা দিয়ে ধনুকের পিঞ্জনের তাঁতে আঘাত করতে হয়। নীচে থাকে তূলা। এর ফলে তুলা খুব ভাল পেঁজা হয়ে যায়।

পাঁজ পিড়ি—তুলার পাঁজ তৈরি করবার জন্য পাঁজ পিড়ি, হাতল ও একটি পাজ কাঠি প্রয়োজন। পাঁজ কাঠি লোহা, পিতল, বাঁশ প্রভৃতির



পাঁজ পিড়ি

হয়ে থাক। পাঁজ পিড়ি হবে ৩৮সেমি × ৩৫সেমি। পিঁড়ির নীচে একদিকে ৫ সেমি উঁচু করে একটি কাঠ লাগাতে হবে। পাঁজ কাঠি হবে ২৫সেমি থেকে ৩০সেমি লম্বা ও ৭সেমি মোটা। পাঁজ কাঠির এক দিক সরু করে নিতে হয়, না হলে পাঁজ বের করা যাবে না। পাঁজ ১৬সেমি লম্বা, ১গ্রাম তুলার ওজনই বাঞ্ছনীয়।



পাঁজ পিড়ির হাতল

তকলি—সম্পূর্ণ তকলির ওজন ১৭ গ্রাম, শলাকার ওজন ৫গ্রাম, এর দৈর্ঘ হচ্ছে ১৬ থেকে ১৭ সেমিঃ, ব্যাস ·৫ সেমি। এর মাথায় ·৫ সেমি পরিমিত স্থান চ্যাপটা করে একটি খাঁজ কাট। এই খাঁজ কাটা অংশকে নাক বলে। শলাকার নীচের দিক থেকে ১·৫ সেমি, উপরে একটি চাকটি থাকে। চাকটির ব্যাস ২ সেমি। শলাকার নীচের অংশ সূচাল থাকে।

তকলিতে সূতা কাটা—ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনির দ্বারা তকলিটিকে ডান দিকে ঘুরাতে হবে। বাম হাতের তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুলির ফাঁকে রেখে নিম্নভাগ বুড়ো আঙ্গুল ও অনামিকার দ্বারা পাঁজের নীচের দিক টিপে রাখতে হবে। এরূপ করলে তকলি থেকে সূতা বের হয়ে আসবে, তখন তকলি ঘুরিয়ে আর একবার সূতা পাক দিয়ে সূতো শক্ত করতে হবে। সূতা কাটবার সময় যেখান থেকে সূতা বের হচ্ছে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সূতা যাতে সমান বের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূতা কাটবার সময় অসমান সূতা বের হলে তা ফেলে দিয়ে সমান সূতা কাটতে হবে।



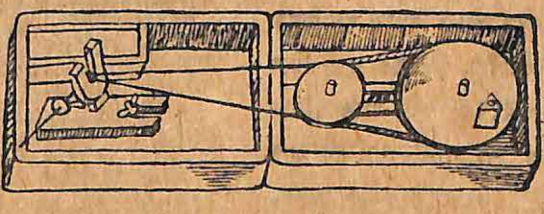
তকলি পাঁজ কাঠ

তকলি মাটি বা বাঁধান মেঝের উপর রেখে কখনোও ঘুরাবে না। একটি কার্ডবোর্ডের টুকরো (১৮ সেমি × ১৮ সেমি) কেটে তার উপর তকলি রেখে ঘুরাবে। এই কার্ডবোর্ডের টুকরোকে বলে দফতি।

চরকা—চরকা নানা রকমের হয়, তাদের মধ্যে (১) কিষান চরকা, (২) বাক্স চরকা, (৩) পাখি চরকা ও (৪) অম্বর চরকার নাম করা যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে বাক্স চরকাই ব্যবহৃত হয়।

বাক্স চরকা—বাক্স চরকার বিভিন্ন অংশ আছে।

(১) বাক্স চরকা যে লম্বা কাঠটির উপর বসান থাকে তাকে



বাক্স চরকা

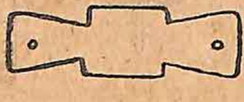
আসন বলে। বড় চাকাটির নাম নাম মূলচক্র। ছোট চাকাটির নাম গতিচক্র, টেকোর আদনকে বলে মুড়িয়া বা টেকোধারক। তকলির

কাজ যে করে তাকে বলে টেকো। ছোট চাকার নীচের যে লোহার অংশটি আছে তাকে বলে **পুলি**। যে দুটি লৌহ শলাকার উপর চাকা দুটি ঘোরে, তাকে বলে **ধুরি**। বড় চাকা ও ছোট চাকার মধ্যে যে মোটা দড়ি লাগানো থাকে তা হচ্ছে **মালদড়ি**। ছোটো চাকার খাঁজ এবং যে টেকোর পুলির সঙ্গে যে সূতা রয়েছে তাকে বলা হয় সরু মালদড়ি।

চরকায় সূতা কাটা—তকলির মত একই প্রথায় তুলার পাঁজ থেকে চরকায় সূতা কাটতে হবে। ডান হাতে হাতল ঘুরিয়ে চরকা চালাতে হবে এবং বাম হাতে তকলির মত করেই পাঁজ টেকোতে সূতা বের করে পাক দিয়ে সূতা শক্ত করে টেকোতে জড়াতে হবে। সমান সূতা যাতে বের হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সূতা তৈরি হলে প্রথমে নাটাই ও পরে অটেরনে সূতা জড়াতে হবে।

অটেরন—অটেরন দৈর্ঘ্যে ২৮সেমি ও প্রস্থে ৯সেমি, ও মোটা ১সেমি। এরূপ মাপ রেখে ঠিক দুই চক্কর দিলে ১মিটার সূতা জড়ান যাবে।



অটেরন

সূতার হিসাব :—৬০সেমিতে—১ তার। ৪০ তারে—এক পাটি
১৬০ তার বা পাটিতে—১লাটি।
১৬ পাটি বা ৬৪০ তারে—এক লাছি বা এক গুণ্ডি।

তাঁত চালানো, কাপড় তৈরি : সূতা কাটার সাথে তাঁতের কাজও চাই, না হলে কাতাই শিল্প সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই তাঁতের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে করতে হবে। তকলিতে বা চরকায় যদি সরু সূতা কাটা যায় তাহলে টানা ও পোড়েন এই দুটো মোটা হলেও চলতে পারে। কিন্তু তাতে কাপড় খুব মোটা হবে। সাধারণতঃ মিলের সূতা দিয়ে টানা দিতে হবে। সূতা যাবে সানার দিয়ে। ৪০ নং সানায় ২·৫ সেমিতে ২০ ঘর সূতা। প্রতি ঘর ২টো অর্থাৎ মধ্য ৪০ ঘর সূতা। এদিকে থাকিবে 'ব' বা ঝাপ, সেটা তারের বা সূতায় হতে পারে এবং সেটা প্যাডলের সাথে ওঠানামা করবে। এদিকে পোড়েনের



তাঁত চালনা

সুতা নলিতে ভরে মাকুতে করে টানার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করবে। প্রত্যেক বার মাকুর সুতা বসে গেলে সানাটি টেনে সুতা শক্ত করে বসাতে হবে, এরূপ করতে করতে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কাপড় তৈরি করা যায়।

হাতে কাটা মোটা সুতা ডবল করে মোটা চাদর, শতরঞ্চি, আসন ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

মণিপুরি তাঁত—মণিপুরি তাঁতে কাজ করতে খুব সুবিধা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই ভাবে কাজ করতে পারে। একটি হুকের সাথে একদিকের সুতাগুলো জড়ান থাকে। সেই হুক কোমরে জড়ান থাকে। অপর দিকে টানার মুখ। সেটা কাঠে জড়ানো থাকে। সানা থাকে ছোট। 'ব'ও থাকে। টানা চওড়া হয় ১৫ সেমি। হাত দিয়েই মাকু চালান হয় ও চিরুনির মত যন্ত্র দিয়ে সেই সুতাকে টেনে আঁট করা হয়। এই মণিপুরি ফিতাগুলি বিভিন্ন রং এর সমাবেশে তৈরি হয় যাতে পরে এগুলিকে জোড়া দিয়ে বা ঢাকনা, ব্যাগ, আসন, ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ঝাড়ু তৈরি

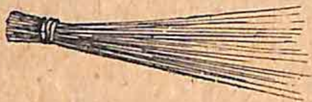
আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। গান্ধীজী বলেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা সাফাই থেকে আরম্ভ। সাফাই এর উপর কেন গান্ধীজী এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন? গুরুত্ব দেখার কারণ হচ্ছে পরিবেশ যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর থাকে তাহলে মনও পবিত্র হয় এবং কাজে শিশুদের আগ্রহী হওয়া সহজতর হয়।

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের দুদিক থেকে যত্নশীল হতে হবে, প্রথমত আমরা পরিবেশে নানা জিনিস ফেলে অপরিচ্ছন্ন করব না, দ্বিতীয়ত পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হওয়াটা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হতে পারে। বাতাসে গাছের পাতা, নানা জঞ্জাল এসে জড় হতে পারে, সেগুলিকে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। কি করে করব?

ঝাঁটার সাহায্যে সমগ্র স্থান পরিষ্কার করতে হয়। ঝাঁটা দেওয়া একটি কাজ। এর সাথে আর একটা কাজ যুক্ত করে দিলে ভাল হয়। ঝাঁটা তৈরি করে, তবে ঝাঁট দিতে হবে। নানা রকমে ঝাঁটা তৈরি করা যায়।

(১) বাঁশের শলায়, (২) নারকেল পাতার কাঠিতে, (৩) কাশফুলের গাছের মত একরকম গাছের শলাকা ও পাতায় (৪) ছন দ্বারা।

১। **বাঁশের শলাকার ঝাঁটা**—সোজা বাঁশ ৬০ থেকে৭০ সেমি কেটে, মধ্যদিয়ে কেটে কেটে খুব সরু করে প্রায় আধ কিলো শলাকা তৈরি কর। পরে মুখের দিকটা চেপে ধরে প্রায় ৭।৮ সেমির পর ভাল করে তার দিয়ে বেঁধে দাও। খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে। পরে মুখের বাইরের দিকে কাঠের একটি গোঁজ বসিয়ে খুব করে ঠুকে দাও। তাহলে ঝাঁটাটি খুব শক্ত হবে।



বাঁশের শলাকার ঝাঁটা

২। **নারিকেলের শলাকার**—নারিকেল গাছের পাতা অনেকগুলি নাও, পরে শুকাতে দাও। ভাল করে শুকোলে পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেল এবং শুধু শলাকাটি রেখে দাও। এরূপ ভাবে যখন প্রায় ৬০০ গ্রাম শলাকা তৈরি হবে, তখন শলাকাগুলি একমুখী করে মোটার দিকে ভাল করে বেঁধে ফেল। তার দিয়ে কিংবা প্লাসটিকের ফিতা বা বেতের ফিতা ইত্যাদি দ্বারা পর পর ঘুরিয়ে বেঁধে ফেল। পরে উপরে একটি কাঠের গোঁজ বসিয়ে দাও। খুব শক্ত হাতে ঠুকে দিও, তাহলে ঝাঁটাটি শক্ত হবে।

৩। **ফুল ঝাড়ু**—ঘর ঝাঁট দেবার জন্য এই জাতীয় ঝাঁটা খুব ভাল। উঁচু জায়গায় এক রকম, কাশফুল গাছের শলাকার মত গাছ জন্মে, ফুলও ধরে,



ফুল ঝাড়ু

পাতাগুলি ছোট ছোট। এর নাম এক এক জায়গায় এক এক রকম। ২৫০ গ্রাম শলাকার গাছের পাতা একত্র করে। মুখের দিকেতে প্লাস্টিকের ফিতে বা টিনের পাতলা পাত দিয়ে বেঁধে ফেল। বাঁধনটা যদি alternate বুনটের মত হয় তবে ভাল। এই ঝাঁটায় রোঁজ ঝাঁট না দিলেও চলে।

৪। **ছনের ঝাড়ু**—এই ঝাঁটা ছোট হয়। এই জাতীয় ঝাঁটা ধানের গোলায় ধান এক করা বা ঘর পরিষ্কার করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর বাঁধনটাও alternate বুনট হলেই ভাল।

নিরাপত্তামূলক শিক্ষা

(Safety Education)

মানুষের জীবন বর্তমানে এত জটিল হয়ে পড়েছে যে বিপদ যে কোন জায়গা থেকে আসবে, তার কোন স্থিরতা নেই, তাই সুস্থ দেহে বাঁচতে হলে খুব সাবধানে চলতে হবে।

রাস্তায় চলা—রাস্তায় চলতে হলে খুব সাবধানে চলতে হবে। কলকাতার শহরে পেভমেন্ট বা পায়ে চলার জন্য যে পাকা পথ আছে, সেই পথে সর্বদা চলতে হবে। বাম দিকের পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। ভিড় দেখলে ভিড় ঠেলাঠেলি না করে একটু অপেক্ষা করে ভিড় কমলে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ভিড়ের মধ্যে গেলে তোমার পকেটমার হয়েও যেতে পারে।

রাস্তা পার হওয়া—মোড়ে এসে রাস্তা পার হলেই ভাল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ থাকে। তারা গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। আর সেখানে দুদিকের রাস্তাতেই সাদা দাগ আছে, সেখান দিয়ে মানুষ রাস্তা পার হবে। পুলিশ যখন যেদিকের রাস্তা বন্ধ করে দিল, তার উল্টো দিক তখন খোলা। তখন তোমরা সাদা দাগের মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হতে পার। আর মোড় ছাড়া যদি অন্যস্থান দিয়ে তোমাকে রাস্তা অতিক্রম করতে হয়, তাহলে পেভমেন্ট থেকে নেমে প্রথমে ডানদিক পরে বামদিক, এবং তার পরে ডানদিকে গাড়ি আসছে কি না দেখে, রাস্তার অর্ধেক পর্যন্ত যাও, তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে বামদিক পরে ডানদিক এবং আবার বামদিক দেখে বাকী রাস্তাটুকু পার হয়ে যাও।



যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

ট্রামে-বাসে চড়া—আগে ট্রামে লেখা থাকত Wait till the car stops, এখন আর সেসব নেই। মানুষ উঠতে না উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, মানুষ ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় যথাসম্ভব সাবধানে গাড়িতে উঠবে ও নামবে।

এত গেল শহর কলকাতার কথা। বাইরের শহরে যেখানে পেভমেণ্ট নেই, সেখানে নিজের বামদিক ঘেষে হাঁটবে, তাহলে সাধারণ অবস্থায় সম্মুখ দিক থেকে গাড়ি-ঘোড়ার ধাক্কা দেবার সম্ভাবনা থাকবে না। গ্রাম দেশেও এখন লোকের ভিড় কম নয়, সেখানেও বামদিক ঘেষে চলা ভাল। যেসব গ্রামের মধ্য দিয়ে বাস চলে, সেসব স্থানে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে রাস্তায় চলতে হয়।

রাস্তায় চলাফেরাতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেও মাঝে মাঝে ছোটখাট বিপদ হতে পারে। সেরূপ বিপদ ঘটলে তার **প্রতিকার** সম্বন্ধে জানতে হবে।

কেটে যাওয়া—হয়ত কোন জায়গায় কেটে গেল, রক্তপাত হল। সেখানে আইওডিন বা ডেটল লাগিয়ে দিতে হয়। যদি ক্ষত খুব গভীর হয়, তাহলে রোগীকে শুইয়ে দিয়ে ক্ষত অংশটি উঁচু করে রাখতে হয়। খুব বেশি রক্তপাত হলে টুর্নিকেটের (tourniquet)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। টুর্নিকেট হচ্ছে শক্ত প্যাড সংযুক্ত একপ্রান্তে একটি বকলস-আঁটা দুই ইঞ্চি চওড়া একটি শক্ত ব্যাণ্ডেজ। ডগাতে একটি কাঠ লাগান থাকে। এটি মোড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজটি শক্ত করতে হয়। কিন্তু টুরনিকেটত সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজনবোধে রুমাল টুর্নিকেটের রকম করে খুব কষে বাঁধতে হয়। রক্ত কমে এলে আইওডিন বা ডেটল লাগাতে হয়।

মচকে যাওয়া—মুচড়ে যাওয়ার জন্য হাড়ের সন্ধিস্থলের অস্থিবন্ধনীগুলি বা ligaments ছিঁড়ে যায়। এটাই মচকে যাওয়া। মচকে গেলে ঐ স্থানে বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিতে হয়।

হাড় ভাঙ্গা বা Fracture—হাড় ভেঙ্গে গেলে হাড় বসাবার চেষ্টা না করে কাঠের টুকরো দিয়ে ক্ষতের অংশের মাপে দেহের অপর অংশ বেঁধে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাও, তিনিই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

পোড়া বা ঝলসান—পোড়া বা ঝলসানিতে জায়গাটা লাল হয়, ফোসকা পড়ে ও ব্যথা হয়। ক্ষতস্থানে বার্ণল বা চায়ের জল দাও।

কাপড়ে আগুন লাগা—কাপড়ে আগুন লাগলে রোগীকে মাটিতে শুইয়ে কম্বল চাপা দিয়ে গড়াগড়ি দিইয়ে দাও। আগুন নিভে যাবে। পরে ক্ষতস্থানে বার্ণল লাগাও ও ডাক্তার ডাক।

হুল ফুটান—কাঁকড়া বিছা, ভিমরুল ও বোলতা প্রভৃতি কামড়ায় না, তারা হুল ফুটিয়ে দেয়। প্রথমেই হুলটি বের করতে চেষ্টা করতে হবে। হুল বের হলে অনেকটা যন্ত্রণা কমে যাবে। নথ, চিমটা, ফাপা চাবির মুখ ইত্যাদির সাহায্যে

হুল তুলে ফেলা যায়। টিনচার আইওডিন বা এমোনিয়া, মেথিলেটেড স্পিরিট ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে ব্যথা কমে যায়। এসব কাছে না পাওয়া গেলে কাপড় ধোবার সোডা বা ছোটো পেঁয়াজের রস ক্ষতস্থানে দিলে ব্যথা কমে যাবে।

সাপের কামড়

আমাদের দেশে বহুলোক প্রতি বৎসর সাপের কামড়ে মারা যায়।

দেহের যে অংশে বিষাক্ত সাপে কামড়েছে, তার উপরের অংশে পর পর দুটি স্থানে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। সাপ যেখানে দংশন করেছে সেখানে ছুরি দ্বারা সমান্তরাল করে আরও কিছুটা কেটে তাতে গরম জল ঢাল। রক্তপাত হবে এবং রক্তের সাথে সাপের বিষ বের হয়ে যাবে। ক্ষতের মধ্যে পারমাঙ্গানেট অব পটাশ দাও, এর মধ্যে চিকিৎসক ডেকে আন। তিনি এসে পরের ব্যবস্থা করবেন।

পাগলা জন্তুর কামড়

পাগলা কুকুর বা শিয়ালে কামড়ালে খুব বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এদের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। জলাতঙ্ক রোগ হলে রোগী জল দেখে ভয় পাবে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যাবে।

পাগলা শিয়াল বা কুকুর কামড়ালে ক্ষতস্থানটি কষ্টিক পটাশ বা নাইট্রিক, বা কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। গরম লোহার সাহায্যেও পুড়িয়ে দেওয়া যায়। এরপরে ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী রোগী পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটে ইনজেকশন নেবার জন্য যাবে।

জলে ডোবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিবিধান

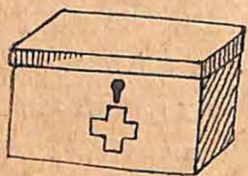
জলে ডোবা ব্যক্তিকে জল থেকে তুলে প্রথমে গলায় আঙ্গুল দিয়ে গলগহ্বর পরিষ্কার কর। তারপর রোগীর মুখ নীচের দিক করে উবুড় করে তাকে শোয়াও। রোগীর কপালের নীচে তার একটি হাতের উপর আর একটি হাত রাখ। মাথা একদিকে সামান্য কাত হবে। নাক মুখ খোলা থাকবে।

প্রতিবিধানকারী রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পঞ্জরাস্থির উপর হাত দুটি এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে হাত দুটি রোগীর শ্রোণীচক্রের উপর এসে না পড়ে। কনুই ও কটিদেশ সোজা রেখে প্রতিবিধানকারী ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকবে, ফলে তার দেহের চাপ রোগীর তলপেটে ও মধ্যচ্ছদার উপর পড়বে। দু সেকেণ্ড

ধরে এ রকম চাপ পড়বে এবং ফুসফুসে জল থাকলে জল বের হয়ে আসবে, এবং পরে রোগী নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। দু সেকেণ্ড চাপ ও তিন সেকেণ্ড শিথিল, এভাবে চললে রোগী বেঁচে থাকলে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স (First Aid Box)

অত্যাবশ্যক সাময়িক ব্যবস্থার জন্য প্রতি গৃহে একটি করে প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স থাকা প্রয়োজন। এই বাক্সে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি থাকবে :—

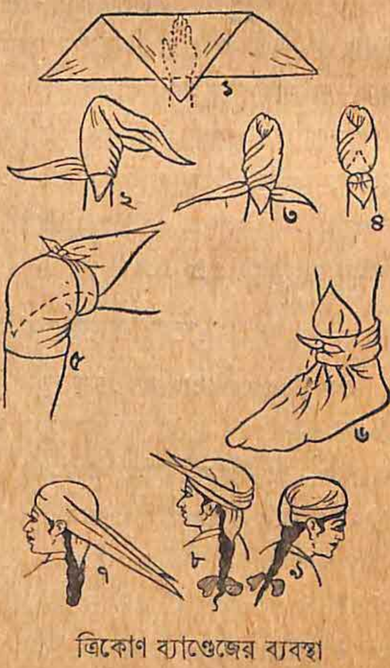


প্রাথমিক সাহায্য বাক্স

(১) ডেটল (Dettol), (২) টিংচার আইওডিন (Tincture Iodine), (৩) টিংচার বেনজয়িন (Tincture Benzoin), (৪) কার্বলিক এসিড (Carbolic Acid), (৫) পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট (Potassium Permanganate), (৬) স্মেলিং সল্ট (Smelling salt), (৭) এক শিশি এমোনিয়া (Ammonia) (৮) এক শিশি বার্ণল (Burnol), (৯) এক শিশি রেকটিফাইড স্পিরিট (Rectified spirit), (১০) বরিক কটন (Boric Cotton), (১১) স্টিকিং প্ল্যাষ্টার (Sticking Plaster), (১২) সরু কাঁচি, (১৩) নোভালজিন, (১৪) ঔষধের গ্লাস, (১৫) বিভিন্ন ধরণের ব্যাণ্ডেজ ও (১৬) কার্বলিক সাবান।

এই বাক্সটি সাথে থাকলে অসময়ে খুবই উপকারে আসে।

ব্যাণ্ডেজ—ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া ভাল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। একই ধরণের ব্যাণ্ডেজ সব জায়গায় চলে না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধাও হাতে-কলমে শিখে নিতে হয়।



ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার—ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ বলতে ত্রিকোণ বস্ত্র-

খণ্ডের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করাকে বুঝায়। হাতের চেটোতে যদি আঘাত লাগে তাহলে এখানে সহজে একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লাগান যেতে পারে। পায়ের পাতা ও গোড়ালিতেও ঐ ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারা যায়। ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের ছবিগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে কি ভাবে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে।

সাধারণ রোলার ব্যাণ্ডেজ—এরূপ ধরণের ব্যাণ্ডেজের 'গুলি' পূর্বেই তৈরি করে নিতে হয়। বিভিন্ন আঘাতের স্থান অনুযায়ী ব্যাণ্ডেজের কাপড় চওড়া ভাবে কাটতে হয়। সাধারণতঃ হাতে পায়ে, এবং মাথায় চোট লাগলে লম্বা রোলার ব্যাণ্ডেজের সাহায্য নিতে হয়। রোলার ব্যাণ্ডেজের নমুনা দেখ।



রোলার ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার

বিভিন্ন রোগ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা

আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে কি ব্যবস্থা করতে হয়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। কিন্তু আমাদের অনেক অদৃশ্য শত্রু আছে। তাদের আক্রমণ থেকে আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে। না হলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

প্রথমতঃ আমাদের সর্বদা **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন** থাকতে হবে। শরীরে ময়লা জমতে দেওয়া উচিত নয়, আর ময়লা কাপড়-চোপড় পরাও উচিত নয়। ময়লার মধ্য খোস পাঁচড়ার জীবাণু বাসা বাধে; একজিমা, দাদ প্রভৃতি রোগ হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে এসব রোগ হতে পারে না।

রোজ **দাঁত মাজলে** দাঁতের রোগ হয় না। নিমের দাঁতন, টুথপেষ্ট ও ব্রাস, দশন-সংস্কারের গুঁড়ো, তেল-লবণ ইত্যাদি যে কোন একটি দিয়ে দাঁত প্রতিদিন মাজা দরকার।

প্রতিদিন ভোরে উঠে চোখে **জলের ঝাপটা** বার পনের দিলে চোখ ভাল থাকে। চোখের রোগ হয় না।

কানে সপ্তাহে একদিন **সরষের তেল** আঙ্গুল দিয়ে দিলে কানের ময়লা বের হয়ে আসে, ময়লা জমে কান পাকার আর ভয় থাকে না।

রোগ জীবাণুর প্রবেশপথ

রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে—

১। বায়ুর সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।

২। খাদ্য ও পানীয়ের সাথে।

৩। ক্ষতযুক্ত দেহ-চর্মের সাহায্যে বা কীটাদি দংশনে।

রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করার পরে দেহে যে জীবাণু প্রতিষেধক বিষ বা Anti Toxin আছে তা রোগ জীবাণুকে বাধা দেয়। ফলে অনেক সময় রোগ হয় না, কিন্তু Anti Toxin যদি এঁটে উঠতে না পারে তাহলে মানুষ অসুস্থ হয়।

সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিজেদের বা অপরকে রক্ষা করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে।

(১) **বিজ্ঞপ্তিকরণ** (Notification)—কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে স্থানীয় স্বাস্থ্যাধিকারিক (Health Officer)-কে জানাতে হবে। পঞ্চায়েতরাজের অধীন বা পৌর বিভাগের অধীন স্বাস্থ্যাধিকারিকও আছেন। তাঁদের জানান যেতে পারে; রোগ যাতে ছাড়তে না পারে তার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। রোগীদের স্থানান্তরিত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি আধিকারিকদের কাজ।

(২) **ব্যক্তিগত প্রতিষেধন** (Immnisation)—বসন্ত, হাম, টাইফয়েড একবার হলে আর সাধারণতঃ দ্বিতীয়বার হয় না। রোগের প্রতিরোধ শক্তি এর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। টিকা, ইনজেকশন ইত্যাদি দিলে রোগের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। একে বলে Immunisation।

(৩) **স্বতন্ত্রীকরণ** (Quarantine) ও **পৃথকীকরণ** (Isolation)—সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সংক্রামিত ব্যক্তিদিগকে ও রোগাক্রান্ত হতে পারে এমন সব ব্যক্তিদিগকে আলাদা করে রাখা দরকার। অন্যান্য ব্যক্তিরা যাতে এদের সংস্পর্শে না আসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় রোগ ছড়াতে

পারবেনা। বসন্ত, হাম, কাশি, টাইফয়েড জ্বর, ডিপথারিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ বিশেষ ফলপ্রদ।

(৪) **বিশোধন** (Disinfection)—রোগের বীজাণুসমষ্টিকে নির্বীজিত করাই হচ্ছে বিশোধনের উদ্দেশ্য।

তিনটি উপায়ে বিশোধন করা যায়। (১) প্রাকৃতিক উপায়ে (২) উত্তাপের দ্বারা এবং (৩) রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে।

(১) **প্রাকৃতিক উপায়ে**—প্রখর সূর্যকিরণে জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, তাই সূর্যের তাপ যাতে কাপড়ে-চোপড়ে, বিছানায় লাগে সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে।

(২) **উত্তাপের দ্বারা**—জীবাণু-দুষিত জামা-কাপড় পুড়িয়ে ফেলা ভাল। না সম্ভব হলে কার্বলিক লোশন, ফিনাইল জলে ডুবিয়ে নিলে জিনিস জীবাণু মুক্ত হতে পারে।

(৩) **রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা**—ব্লিচিং পাউডার, চূণ, পারমাঙ্গানেট অব পটাশ, কার্বলিক এ্যাসিড, ফরমালিন বাষ্প, ফিনাইল, ডেটল, আইজল, লাইজল ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা জিনিসপত্র ধুলে সেগুলি জীবাণুমুক্ত হয়।

পুতুল নাচ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে পুতুল নাচের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের কর্মপ্রবণতা ও কল্পনাপ্রবণতা এই উভয়েরই পরিপূর্তি সম্ভব। এর তিনটি দিক—

(১) পুতুল তৈরি।

(২) পুতুলের-গল্প যা হবে তা অভিনয়ে রূপায়িত করা হবে অর্থাৎ গল্প ও সংলাপ রচনা।

(৩) পুতুলগুলির দ্বারা অভিনয় করান।

(১) **পুতুল তৈরি**—পুতুল নাচের জন্য যে পুতুল তৈরি করা হবে তার বৈশিষ্ট্য আছে, সাধারণ পুতুল হলে চলবে না। পুতুলের ঘাড় নড়া-চড়া করা চাই; সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে নড়া চাই। অর্থাৎ পুতুলের মাথাটি আলগাভাবে তৈরি করা হবে। গলার কাছ থেকে ঝুলান থাকবে ক্রেপ কাগজের ঘাগরা। পুরুষ বা মেয়ে চরিত্রের জন্য একই ধরণের ঘাগড়া। কারণ ঘাগড়ার মধ্য দিয়ে

হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পুতুলকে নড়া-চড়া করতে হবে। আর এক রকমের পুতুল নাচ হয়, যেখানে সুতা দিয়ে পুতুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যাঁরা দক্ষ শিল্পী তাঁরাই সব কাজ করে থাকেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সাধারণ পুতুল নাচই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল।



কার্ড বোর্ডের মাথা ক্রেপ কাগজের ঘাগরা



কাপড়ের মাথা

পুতুলের মাথা তৈরি—তোমরা পেষ্টবোর্ডের কাজ কিছু কিছু শিখেছ। পেষ্টবোর্ডটি এভাবে কেটে জোড়া লাগিয়ে মুখ চোখ এঁকে রঙ লাগিয়ে গলা থেকে ক্রেপ কাগজের ঘাগরা ঝুলিয়ে দাও। ঘাগরার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পাত্র বা পাত্রীর মাথা নাড়ান যাবে।

পেষ্টবোর্ডের পুতুলের মুখ ছাড়া আর এক ধরণেরও মুখ তৈরি করা যায়। অনেকটা ন্যাকড়া গোল করে নীচের দিকটা গোল করে ভাল করে বেঁধে দাও। উপরের ছবির মত করতে চেষ্টা কর।

বড় করে গোল করে রঙ দিয়ে মুখ চোখ ভুরু ইত্যাদি এঁকে দাও। চুল লাগাও। আর গলার কাছ থেকে রঙিন ক্রেপ কাগজ বা ব্যবহৃত রঙিন কাপড় লাগিয়ে ঘাগরার মত করে দাও।

(২) **পুতুলের গল্প**—এবার পুতুলের যে নাটকাভিনয় হবে তার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য আগে গল্প স্থির হবে, পরে পুতুলগুলি তৈরি হবে। কিন্তু পুতুল যেহেতু তৈরি করতেই হবে সেজন্যই পুতুলের কথা আগে বলা হল।

ধরা যাক, পুতুল নাচের নাটকাভিনয় হবে **সীতাহরণ**। এখানে প্রথম দৃশ্যে শূর্পণখা এসেছে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কাছে। এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারাই সংলাপ রচনা করাতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি জানে, তবু আলোচনামূলক কথাবার্তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানবে—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটীর কুটিরের দাওয়ায় বসে আছেন এমন সময় শূর্পণখা এসে রামকে বিয়ে করতে চাইল, পরে লক্ষ্মণকে এবং শেষে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দিলেন। বিষয়টি সাজিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরাই বলবে এবং কার কোন কথা হবে তা সংলাপ হিসাব সাজাবে। পুতুলগুলির সাজ কি রকম হবে, তাও স্থির হবে, এবং রঙ ও তুলির সাহায্যে পুতুলগুলির সংস্কার সাধন, কাপড় পরিবর্তন ইত্যাদি করাতে হবে।

এবার আসছে তৃতীয় স্তর।

(৩) পুতুলদের দিয়ে অভিনয় করান—অভিনয়ে এই দৃশ্যে চারটি পুতুল রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও শূর্পণখা। এক একটি পুতুলের জন্য এক এক জন অভিনেতা। প্রত্যেকে সংলাপ মুখস্থ করবে, এবং কথাগুলি বলবার সময় পুতুলদের মুখ কিভাবে নড়বে তার মহড়া দিয়ে রাখবে।

এবার প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য জায়গা রেখে একদিকে ঘরের প্রস্থে একটি মোটা পর্দা টাঙ্গাতে হবে। পর্দাটি মাটি থেকে প্রায় ১৩৫-১৪০ সেমি খাড়া থাকবে। পেছনে থাকবে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ। সকলে যে যে অংশ গ্রহণ করবে তার হাতেই থাকবে সেই পুতুল। তারা নীচে বসে থাকবে। এই দৃশ্যে পুতুলের রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বসে আছেন। তাঁদের মাথা পর্দার উপরে। সীতা ও লক্ষ্মণ, রামের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় পর্দার ঠিক উপর মাথা রেখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে শূর্পণখা প্রবেশ করল। তারপর রামের সঙ্গে কথা বলল। রাম মাথা নাড়লেন; পরে দেখালেন সীতাকে ও লক্ষ্মণকে। শূর্পণখা গিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে মাথা নেড়ে কথা বলল। লক্ষ্মণ মাথা নাড়লেন, তখন শূর্পণখা সীতাকে খেতে গেল। তখন লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে গিয়ে আক্রমণ করল। দৃশ্য শেষ হল। সমবেত গান বা একক গান যদি থাকে তবে পর্দার ভেতর থেকে গান গাওয়া হবে। বাজনাও সেখানে থাকবে।

পরের দৃশ্যে রাবণ, শূর্পণখা ও মারীচ। পূর্বের ন্যায় কথাবার্তা। তার পরের দৃশ্যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের কাছ দিয়ে সোনার হরিণের প্রস্থান। সীতার কথা,

রামের অনুসরণ, রামের গলা অনুকরণ করে মারীচের চিৎকার, লক্ষ্মণ ও সীতায় কথা। লক্ষ্মণের গমন।

পরের দৃশ্যে তপস্বী বেশে রাবণের প্রবেশ। কিছু কথাবার্তা, পরে সীতাকে নিয়ে রাবণের প্রস্থান।

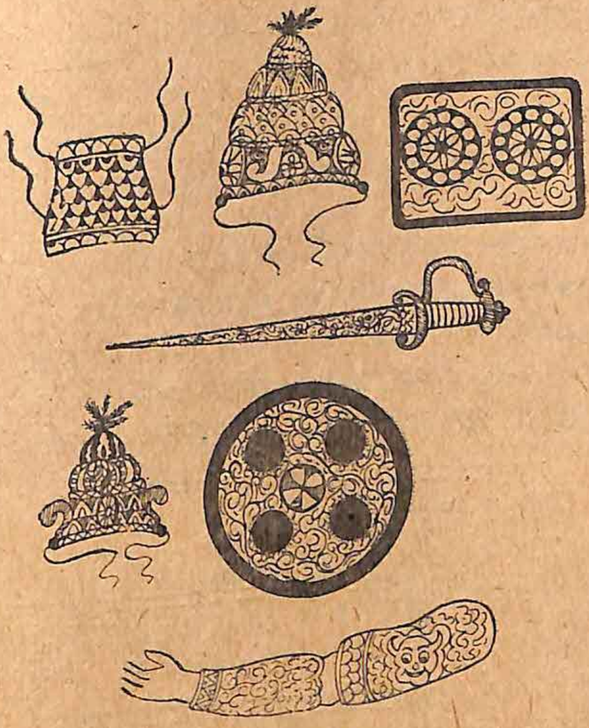
পুতুল নাচ ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিলেই তারা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পূর্ণভাবে করবে। কোন কাজই কঠিন নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সবই সহজ।

নাটকের জন্য সাজ-পোশাক তৈরি

ছাত্র-ছাত্রীরা নাটক মঞ্চস্থ করতে ভালবাসে। যেমন তারা করেছে পুতুল নাচের নাটক। যে-কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, বা সাহিত্যের গল্পকে অবলম্বন করে ছাত্র-ছাত্রীরা নাটকের সংলাপ রচনা করে, শ্রেণীকক্ষেই মঞ্চের ব্যবস্থা করে নাটকের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর যদি নাটকের চরিত্র অনুযায়ী সাজ-পোশাক না হয়, তাহলে নাটক হৃদয়গ্রাহী হবে না। পোশাকই নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান সহায়ক বস্তু। অতএব পোশাক ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রীক সম্রাট হয়ে যদি তিনি সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী পরে কোমরে অসির পরিবর্তে যদি ছড়ি হাতে নিয়ে আসেন, তাহলে পরিস্থিতি হাস্যকর হবে। অতএব অভিনয়ে পোশাক চাই। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীই পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকই বেশি পছন্দ করে। সামাজিক নাটক হলে সাধারণ ধুতি শাড়ী পাঞ্জাবীতে কাজ চলে যায়। কিন্তু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে পোশাক অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পোশাক তৈরী করতে হলে প্রথমে চরিত্রগুলি দেখতে হবে। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে পোশাক তৈরীর পরিকল্পনা করতে হবে। পৌরাণিক নাটকের অস্ত্র হিসাবে সাধারণতঃ ঢাল, তরোয়াল, ধনুক, তূণ ইত্যাদি চাই। ছেলেমেয়েরা কার্ডবোর্ডের কাজ শিক্ষা করেছে। অতএব তরোয়াল, ঢাল ইত্যাদি তৈরী করা অসুবিধাজনক হবে না। মোটা কার্ডবোর্ডের একটি খাপ তৈরি করে তার মধ্যে বাঁশের মোটা চটা পালিশ করে এলুমিনিয়ম রং লাগিয়ে ভিতরে রেখে দিলে

সুন্দর তরোয়াল হল, তরোয়ালে অবশ্য একটি হাতল লাগান থাকবে। মোটা পেষ্টবোর্ডের টুকরো কেটে বা বাঁশের হাতল লাগান অসুবিধাজনক মোটেই নয়। তরোয়ালের খাপ নানাভাবে চিত্রিত বিচিত্রিত করা চলে।



নাটকের অভিনেতাদের বিভিন্ন সজ্জা

বড় পেষ্টবোর্ড ঢালের মত কেটে, কালো রং লাগিয়ে পেছনে হাতল লাগিয়ে সুন্দর ভাবে তৈরি করা যায়। রাজার বা রাণীর মুকুট পেষ্টবোর্ড কেটে তার মধ্যে সোনালি বা রূপালি কাগজ লাগিয়ে তার উপর জরি চুমকি ইত্যাদি বসিয়ে ঝলমেলে করা যায়।

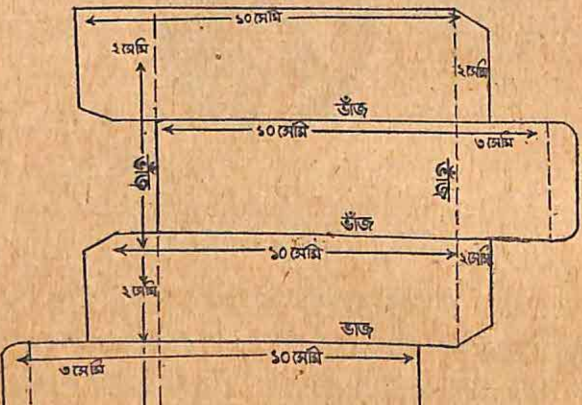
পেষ্টবোর্ড দিয়ে পোশাকের উপরের বিভিন্ন আবরণ যথা বর্ম ইত্যাদি অতি সহজেই তৈরি করা যায়। সোনালি, রূপালি কাগজ ও জরি, চুমকি, সোনালি, রূপালি ফিতা ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হবে। ঝলমলে চুড়ি, ব্যাঙ্গেল, মেয়েদের পোশাকের সহায়ক হতে পারবে। তীর, ধনুক, বাঁশের টুকরো দিয়ে ও তূণ পেষ্টবোর্ড দিয়ে অনায়াসে হতে পারবে।

এরপর হচ্ছে আসল পরিধেয়ের কথা। পুরুষদের পোশাক সাধারণ পাঞ্জাবী এবং সোনালি রূপালি কাগজ ও জরি চুমকি দিয়ে সাজাতে হবে। কিংবা ক্রেপ কাগজ দিয়ে আঙ্গরখা তৈরি করে নিতে পারে। বিভিন্ন রং-এর সিল্কের বা বেনারসী শাড়ী জোগাড় করতে হবে। ছেলেমেয়েরা অভিনয় করবে শুনলে মায়েরা তাঁদের বাক্স খুলে দেবেন।

দাঁতের মাজন প্যাক করা

তোমরা স্কুলে দাঁতের মাজন তৈরি করতে হয়ত শিখবে। এখন সেগুলোকে কি করে প্যাক করে বাজারে বিক্রির জন্য দেবে তাইত সমস্যা।

তোমরা কাগজের কাজে ছোট প্যাকেট কি করে তৈরি করতে হয় তা শিখেছ। তোমরা এই ছোট পাতলা প্যাকেটে দন্তমঞ্জন ভরতি করে আঠা লাগিয়ে দাও। পাতলা অয়েল পেপারের প্যাকেট হলেই ভাল। তারপর পরে একটি



বাক্সের মধ্যে প্যাকেটটি ঢুকিয়ে দাও। প্যাকেট ও বাক্সের মাপ কগজ ও কার্ড বোর্ডের অংশে দেখ।

একটি শক্ত পেষ্টবোর্ড যদি এরূপভাবে কেটে নাও এবং পরে সেঙ্কুরি বোর্ডের উপর ফেলে দাগ দিয়ে কেটে নাও, তাহলে দন্তমঞ্জনের অনেকগুলি প্যাকিং বাক্স তৈরি করতে পারবে।

পোষা জন্তুদের প্রতিপালন

আমাদের পোষা জন্তুরা আমাদের কাছেই থাকে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন আমাদেরই কাজ। আমরা লেখাপড়া শিখি কিন্তু আমরা আমাদের মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখি। এতে লেখাপড়ার কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্যপালন করে আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করি।

আমাদের যেসব পোষা জন্তু আমাদের গৃহে আছে, তারা আমাদের পরম আত্মীয়ও বটে। এরা আমাদের আপন জন। গরু, মহিষ, কুকুর, ঘোড়া, শূকর, বিড়াল ইত্যাদি আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। অতএব তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তারা আমাদের অনেক কিছু দান করে, সেই কথাও স্মরণ রেখে আমাদের উচিত তাদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা।

আমরা এখানে কয়েকটি পোষা জীবজন্তুর কথা আলোচনা করব।

গরু—বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে গরুই হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী জীব। গরু আমাদের দুধ দেয়। দুধ অত্যন্ত উপাদেয় পানীয় ও বলবর্ধক। ঘি, মাখন, ছানা এবং বিভিন্ন ধরণের মিষ্টান্ন দুধ থেকে তৈরি করা যায়। তাছাড়া গরু আমাদের আরও অনেক উপকার করে। গোমূত্র ও গোবর আমাদের কৃষি জমিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোবরের ঘুঁটেও আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি। গোমূত্র দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ হিসাবেও আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা ব্যবহার করে থাকেন। গরু কৃষিকাজে আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। মরে যাবার পরও গরু আমাদের উপকার করে থাকে। গরুর চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হয় এবং গরুর হাড় দিয়ে নানা জিনিস তৈরি হয় এবং হাড় সার রূপেও ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীনকালে প্রত্যেক রাজা-মহারাজারা গো-পালন করতেন এবং গো-পালন দ্বারাই তাঁরা বিত্তবান ও শক্তিশালী হতেন।

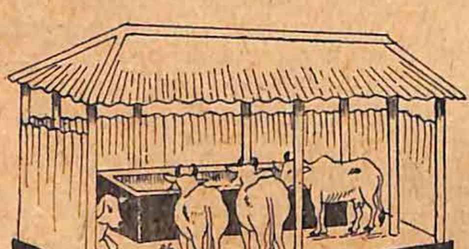
বর্তমানকালেও গরু পালন করে প্রচুর উপার্জন করা যায়। যে গোয়ালার দু চারটি গরু আছে, তার ত' যথেষ্ট উপার্জন। এখানে গরু বলতে গাভী, বলদ, ষাঁড় ইত্যাদি সবারই কথাই বলা হচ্ছে।

গাভী দুধ দেয়, ষাঁড় ও বলদ গাড়ি টানে, বলদ লাঙ্গল টানে। সবদিক থেকেই গরু গো-পালকের উপার্জনের পথ খুলে দেয়।

তাছাড়া প্রতি গরু গোবর ও চোনা (মূত্র) যতটা ত্যাগ করে তা থেকে যথেষ্ট সার পাওয়া যায়।

গো-পালন ব্যবস্থা—গো-পালন অত্যন্ত লাভজনক। অতএব আমরা গ্রাম দেশে প্রত্যেক বাড়িতে গো-পালনের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব। গো-পালনে খরচ অনেক, একথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু গ্রাম দেশে একটু চেষ্টা করলে কম খরচে গরু পালন করা যায়। যার কিছু নেই, সেও একটি ছোট বকনা চেয়ে-চিন্তে এনে ঘাস ও অন্যান্য জিনিস খাইয়ে বড় করে তুলতে পারে। দুধ দেবার উপযুক্ত হলে কথাই নেই। তখন গরুই এনে দেবে গৃহে অর্থ ও সম্পদ!

গোশালা—গরুকে প্রতিপালন করতে হলে, তার জন্য ভাল ব্যবস্থা চাই। গরুর প্রতি অতি অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। গরুর বাসস্থানের দুরবস্থার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে গরুর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ খারাপ, ফলে এরা দুধও কম দেয়। অতএব আদর্শ গোশালা নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। বৃষ্টিতে জল-কাদা না জমে এমন উঁচু জায়গায় ঘরটি অবস্থিত থাকবে। উত্তম ছাউনি থাকবে, যাতে জল ভিতরে গড়িয়ে না পড়ে। মেঝে সিমেন্ট হলে ভাল হয়। ঘরে আলো বাতাস চলবে। আর গোশালা সব সময় গরুর মলমূত্র থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রত্যেক গরুর জন্য ৫½ থেকে ৬ বর্গ মিটার স্থান আবশ্যক। গরুকে বিচালি ও ভূষি মিশ্রিত খাবার দিলে ভাল। কাঁচা ঘাস গরু খেতে খুব ভালবাসে।



গোশালা

গরুর বাচ্চা হবার সময় গরুকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে, লোকজন দেখে যাতে গরু ভয় না পায়, গরুকে এমন একটু নির্জন জায়গায় নরম কিছু পেতে দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। সামনে দিতে হবে কিছু কচি ঘাস, যাতে ইচ্ছামত সে কিছু খেতে পারে। গরুর বাছুর হলে গর্ভফুলটি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে গরু সেটিতে মুখ না দেয়। প্রসবের পর গরম জল ও ডেটল মিশিয়ে প্রসব দ্বার ভাল

করে ধৌত করতে হবে। পরে গমের ভুষি সামান্য গরম জলে মিশিয়ে তাতে কিছু গুড় দিয়ে ও সামান্য লবণ দিয়ে গরুকে খেতে দিতে হবে। নবজাত বাছুর থাকবে গরুর সামনে যাতে সে বাছুরের গা ভাল করে চেটে দিতে পারে। বাছুর কিছু পরেই গরুর দুধ পান করতে চেষ্টা করবে।

মহিষ পালন—গরুর মত মহিষও মানুষের অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয় প্রাণী। দুগ্ধ ব্যবসায়ের জন্য এদের প্রতিপালন করলে এরা বরং গরু থেকে বেশি লাভের পথে নিয়ে যাবে। তার প্রথম কারণ যে-কোন সাধারণ মহিষ গরুর চাইতে বেশি দুধ দেবে আর মহিষের দুধে স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশি আছে বলে গরুর দুধের চাইতে মহিষের দুধে বেশি ঘি-মাখন পাওয়া যায়। তাছাড়া মহিষ গরুর চাইতে পরিশ্রমীও বেশি। মহিষের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান। মহিষের মলমূত্র গরুর মলমূত্রের মতই সারের যোগান দিয়ে থাকে।

পালন পদ্ধতি—মহিষের পালন পদ্ধতি গরুর পালন পদ্ধতির মতই। কিন্তু মহিষকে ছেড়ে রাখাই ভাল। মহিষকে বেঁধে রাখলে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। মহিষ জলে থাকে ও সেখানেই সে সুস্থ থাকে। মহিষের খাদ্য গরুর খাদ্যের অনুরূপ। মহিষ যত বেশি খাবে তত তার কাজ করবার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

অশ্ব পালন—সভ্যতার আদিযুগ থেকে ঘোড়া আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে এসেছে। ঘোড়া মালবহন করেছে, গাড়ি টেনেছে, যুদ্ধে সাহায্য করেছে, আরও কত কি? এখন নানা প্রকারের যানবাহনের ব্যবস্থা হয়েছে, এখন ঘোড়ার গুরুত্ব অনেকটা কমেছে, কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে ভারতের নানা জায়গায় ঘোড়ার প্রচলন রয়েছে, বিশেষতঃ গ্রাম দেশেতে বটেই। ঘোড়া গ্রামাঞ্চলে গাড়ি টানে। কলকাতাতেও ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে কারও ঘোড়া থাকলে সে ঘোড়াকে নানা কাজে লাগিয়ে সংসার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে পারে।

ঘোড়াকে দিয়ে শুধু খাটালেই চলবে না। তাকে যত্ন করতে হবে, ভাল খাওয়াতে হবে, যাতে সে কর্মক্ষম থাকে। ছোলা, ঘাস, বিচালি প্রভৃতি ঘোড়ার খাদ্য।

ছাগল ও মেষ—ছাগল থেকে পাঠা ও খাসি হয়। পাঠা ও খাসি আমাদের মাংসের যোগান দেয়। ছাগল দুধের যোগানও দিয়ে থাকে। ছাগলের দুধ বাচ্চাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতে এদের উন্নততর প্রজননের ব্যবস্থা করলে শুধু মাংস নয়, দুধের সরবরাহও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

গ্রাম দেশে ছাগল পালন করে একটি সংসার পালন করা চলে। ছাগল পালনে মূলধন সামান্যই লাগে। ছাগল দেখাশুনা করা, ভাল জায়গায় থাকতে দেওয়া, উপযুক্ত খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করলেই ছাগল ভালভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং তার দামও পাওয়া যাবে ভাল।



মেষ থেকে পশম সংগ্রহ

আমাদের দেশে প্রায় চার কোটি মেষ আছে। মেষগুলি লোমশ ও পশমী লোমযুক্ত। এদের লোম তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এদের লোম বিক্রি করে প্রচুর পয়সা পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার হিমালয়ের পাদদেশে নানা জাতীয় মেষ আছে। ঐগুলি সাদা পশমযুক্ত। ঐ পশম খুব দামী। পশ্চিম বাংলার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে অনেকে ইচ্ছা করলে মেষ পালন করে প্রচুর পয়সা উপার্জন করতে পারে। মেষ পালন যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। তাদের নিয়ে চরতে যেতে হয় এবং কোনটা যাতে হারিয়ে না যায় তা দেখতে হয়।

শূকর—শূকরের মাংসের প্রচুর চাহিদা রয়েছে; পৃথিবীময় এর চাহিদা। সংস্কারবশে হিন্দুরা শূকরের মাংস খায় না।

ছাগলের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি শূকর বংশবৃদ্ধি করে থাকে। একটি শূকর ও দশটি শূকরীর একটি দল থেকে এক বৎসরে প্রায় ১৬০টি বাচ্চা পাওয়া যায়।

শূকরের খাবার খরচ খুব কম। সাধারণতঃ ফেলে দেওয়া বিভিন্ন দ্রব্য, গোয়াল পরিষ্কার করা বিভিন্ন আবর্জনা শূকর খেয়ে থাকে।

পশ্চিম বাংলায় শূকর পালনের একটি উত্তম ক্ষেত্র। গ্রামাঞ্চলে যদি শূকর পালন করা হয়, তাহলে অতি শীঘ্র প্রচুর পয়সা শূকর পালন থেকে পাওয়া যাবে। একটি সাধারণ একচালা ঘরই শূকরদের বাসস্থানের পক্ষে যথেষ্ট। একসাথে গাদাগাদি করে জল-কাদাতে থাকতে এদের আপত্তি নেই।

শূকরী বৎসরে দুবার বাচ্চা দেয়,—একবার আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে ও আবার ফেব্রুয়ারী-মার্চে। একটি শূকরী একবারে ৫।৬টি বাচ্চা দেয়।

কুকুর ও বিড়াল—এতক্ষণ যে সব পোষা প্রাণীদের কথা বলা হল, সেগুলি

মানুষের অর্থানুকুল্যে সাহায্য করে। কিন্তু কুকুর ও বিড়াল প্রত্যক্ষভাবে সেভাবে সাহায্য না করলেও অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

কুকুর—বাড়ি পাহারা দেয়। কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত এবং শেখালে সে অনেক কাজ করতে পারে। কুকুর ব্যবহৃত জিনিসের গন্ধ শুঁকে নিয়ে চোর-ডাকাত পর্যন্ত ধরতে পারে।

বিড়াল—বিড়াল ও কুকুরের মত আমাদের প্রত্যক্ষ অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে না। কিন্তু ইঁদুর মেরে আমাদের গৃহকে ইঁদুরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করে।

বিদ্যালয়ে পশু-পালন শিক্ষা

এই সব বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তারা পরবর্তী জীবনে পশু-পালন বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। যাদের বাড়ির কাছে সামান্য জমি আছে, তারা সেই জমিকে অনায়াসে কাজে লাগাতে পারবে। মূলধন খুব বেশি লাগবে না, যা লাগবে তা হলো আগ্রহ ও জীবজন্তু নিয়ে কিছু পরিশ্রম করা। বর্তমান অর্থনৈতিক জটিলতার দিনে কে কোন দিকে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে, তা কিছু বলা যায় না। অতএব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যখন কর্মশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন, তখন হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়গুলি মারফত হবেই। অতএব আমরা আশা করব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় মারফতই বহুমুখী অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে। বিদ্যালয়ে গো-মহিষ, ছাগল-মেষ ইত্যাদি পালনের ব্যবস্থা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর যদি তাদের সযত্ন প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া যায় তাহলে তারা পশুপালন কাজ অনায়াসে শিখে ফেলবে।

বস্ত্রধৌতি

আজকাল বিদ্যালয়ে কাপড় কাচবার ব্যবস্থা করা উচিত। বস্ত্রধৌতি প্রায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই কাজটি যদি ছাত্র-ছাত্রীরা শিখে যায় তাহলে তারা নিজেদের ও বাড়ির আর সকলের কাপড় কেচে দিতে পারবে। তাতে সংসারের সাশ্রয় কম হবে না। তা ছাড়া যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তীকালে লণ্ড্রি স্থাপন করে বস্ত্রধৌতি বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তারা বিদ্যালয়ের

অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যখন এ বিষয়টিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করেছেন, তখন বিদ্যালয়ে এ শিল্প হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

বস্ত্রধৌতির জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি প্রয়োজন ঃ

(১) **উনুন**—ময়লা কাপড়-জামা গরম জলে ডুবিয়ে সাবান মাখান দরকার, এজন্য গরম জল করবার জন্য উনুন দরকার। পরে ইস্ত্রির জন্য উনুন অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। অবশ্য বাড়ীতে রান্নাঘরের উনুনেই গরম জল ও ইস্ত্রির কাজ চলতে পারবে।

(২) **ডেকচি**—ময়লা কাপড়-চোপড় গরম জলে ডুবাবার জন্য ধাতু নির্মিত ডেকচি হলে ভাল। এই ডেকচিতে জল গরম হবে। মাটির হাঁড়ি হলেও চলবে।

(৩) ময়লা কাপড়-চোপড় ভিজাবার জন্য বড় **টব বা গামলা** থাকা প্রয়োজন। টবটি কাঠের হলেই ভাল হয়। কাঠের টব কিছুদিন ব্যবহারের পর নরম হয়ে পচে যেতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রথম দিকে ভাঙ্গবে না। এ্যালুমিনিয়ম, তামা ও পিতলের গামলাও হতে পারে।

(৪) **বালতি**—ধোয়া কাপড়ে নীল ও মাড় দেবার জন্য বালতির প্রয়োজন।

(৫) কাপড় কাচার জন্য কাঠের একটি **ঢেউ খেলান বোর্ড** রাখতে হবে।

(৬) গরম সাবানজলে কাপড়-চোপড় নাড়বার জন্য ও ভিজে কাপড় উঠাবার জন্য একটি **কাষ্ঠদণ্ড** রাখতে হবে।

(৭) কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা গরম জল থেকে কাপড় উঠিয়ে ঢেউখেলান কাষ্ঠখণ্ডে কাপড় কাচতে হয়। মাঝে মাঝে জলের ছিটে দিতে হয়, পরে আর একটি জলাধার থেকে ধুয়ে নিংড়ে, নীল ও মাড়ের বালতিতে ফেলতে হয়। নীল ও মাড় লাগিয়ে কাপড় নিংড়ে শুকোতে দিতে হয়।

বিঃ দ্রঃ কাপড় কাচবার ক্ষেত্রে আরও দুটি প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

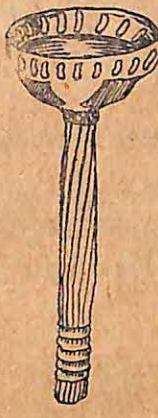
(৮) **ব্রাশ**—কাপড়ে দাগ তুলবার জন্য ব্রাশ ব্যবহার করা দরকার এবং তা রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৯) **মাড় প্রস্তুত করা**—এরারুট, ময়দা ইত্যাদি দিয়ে মাড় প্রস্তুত করতে হয়। পাতলা করে মাড় প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মাড় প্রস্তুত করবার জন্য একটি সসপেন ও একটি হাতা দরকার।

কাপড় ধোয়া হল, নীল ও মাড় লাগানও হল, এখন বস্ত্রাদি শুকান দরকার।

শুকান—আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, বর্ষার সময় ছাড়া আমাদের ধোয়া বস্ত্রগুলি শুকান বিশেষ অসুবিধাজনক নয়। দড়িতে কাপড় টাঙ্গিয়ে দেওয়া যায় বা বেশি জায়গা থাকলে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে বস্ত্র মেলে দেওয়া যায়। দড়িতে বা তারে জামা শুকোতে দিলে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হয়।

কাপড় কাচবার যন্ত্র—এই প্রসঙ্গে কাপড় কাচবার দুটি যন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে এই দুটি যন্ত্র রাখা যেতে পারে। কাপড় কাচবার যন্ত্রটির নাম হচ্ছে **ভ্যাকুয়াম কোণ**। এটি থাকলে কাপড় কাচবার পরিশ্রম



ভ্যাকুয়াম কোণ



জল নিংড়াবার যন্ত্র

খুব বেঁচে যায়। এটি বিদ্যুৎচালিত ও হস্তচালিতও হতে পারে। ময়লা বস্ত্রে সাবান জল প্রবেশ করান এবং ময়লা জল টেনে আনার ব্যবস্থা এই যন্ত্রে আছে। ভারী জিনিস যথা মশারি, বেড কভার ইত্যাদি শয্যাদ্রব্য হাতে কাচা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। ভ্যাকুয়াম কোণে এগুলি কাচলে কষ্টবোধ হবে না।

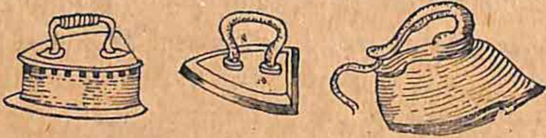
জল নিংড়াবার যন্ত্র—এক রকম যন্ত্র আছে যার দ্বারা সহজে কাপড়ের জল নিংড়ান চলে।

এ যন্ত্র না থাকলেও যদি আমরা কাপড় পিটাবার জন্য একটি কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করি তাহলে এই যন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। কাপড় কাচবার সময় সাবান জল হাতে লেগে থাকে, তাতে হাতের চামড়া খসখসে হয়। কাষ্ঠদণ্ড থাকলে সে অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে চেপে ধরলে জল অনেকটা পড়ে যাবে।

ইস্ত্রি—বস্ত্রধৌতির শেষ পর্যায় হচ্ছে ইস্ত্রি করা। কাপড় পরিষ্কার করে কেচে শুকোলেই পরা যায় না, পারিপাট্য দরকার। তাই কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়।

ইস্ত্রি তিন প্রকারের—

(ক) চ্যাপ্টা লোহার পাতের ইস্ত্রি। এই ইস্ত্রি উনুনে গরম করে ব্যবহার করতে হয়।



তিন রকমের ইস্ত্রি

(খ) দ্বিতীয় ধরনের ইস্ত্রি অনেকটা বাক্সের মত। উপরের ঢাকনাটা খুলে ভিতরে জ্বলন্ত কয়লা রাখলে ইস্ত্রি গরম হয়।

(গ) বিদ্যুৎচালিত ইস্ত্রিও দেখা যায়। তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এ জাতীয় ইস্ত্রিতে আছে। রেশমী ও পশমী বস্ত্র এই ইস্ত্রিতে ইস্ত্রি করা সুবিধাজনক।

গৃহ সংলগ্ন সবজি বাগান

গৃহের সাথে যদি এক ফালি জমি থাকে তাহলে সেই জমিতে সবজি ফলালে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গৃহস্থের যথেষ্ট সাহায্য হয়। বাগানের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ দুর্মূল্যের বাজারে বাগানের ফসল গৃহের অর্থনীতির দিক থেকে অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ, সবজি বাগানের সৌন্দর্য গৃহপরিবেশকে সুন্দরতর করে তোলে, সেকথা না বললেও চলে। তৃতীয়তঃ, বাগান তৈরি করতে গেলে দৈহিক পরিশ্রম প্রয়োজন। দৈহিক পরিশ্রম করলে দেহ সুস্থ থাকে ও দেহ সুগঠিত হয়। চতুর্থতঃ, উৎপাদনের আনন্দ। সবজির বাগানের যাকিছু উৎপাদন হচ্ছে তার আর্থিক মূল্য যাই থাকুক না কেন, উৎপাদনের আনন্দ উৎপাদকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমস্ত দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে নিজ গৃহে যতটুকু জমিই থাকুক না কেন, তাকে উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

বাড়িতে বাগান করতে গেলে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির দরকার হয়।

(১) কোদাল (২) খুরপী ও নিড়েন (৩) কাস্তে (৪) আচড়া (৫) গাছ কাটবার ছুরি বা কাঁচি (৬) জল দেবার জন্য ঝারি।

জমি যদি লাঙ্গল দেবার মত বড় হয় তাহলে ২।১ বার জমিতে লাঙ্গল চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সবজি ক্ষেতের মাটি—সবজি ক্ষেতের মাটির গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নত ধরনের মাটির উপরই ফসল উৎপাদন নির্ভর করে। মাটির মধ্যে সাধারণ চারটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—(১) কর্দম (clay) (২) বালুকা (sand) (৩) চুণ (lime) ও (৪) দাহ্য পদার্থ (humus)।

কর্দমাক্ত মাটি, বেলে মাটি ও চুণ বিশিষ্ট মাটি কোনটিই চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

বেলে মাটিতে বালুকার পরিমাণ বেশি, এই মাটি জল টেনে নিতে পারে বটে, কিন্তু জল বেশিক্ষণ ধারণ করে রাখতে পারে না। গাছ মূল দ্বারা মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে। জল খাদ্যগুলিকে দ্রব করে থাকে। ফলে মূলের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ, কিন্তু জল যদি বেলে জমিতে তাড়াতাড়ি নীচে যায় তাহলে গাছের মূল কিভাবে আহার্য সংগ্রহ করবে ?

পক্ষান্তরে কর্দমাক্ত মাটি অর্থাৎ এঁটেল মাটির জল ধারণের শক্তি বেশি কিন্তু শোষণের ক্ষমতা খুবই কম। এই জমিও চাষের অনুপযুক্ত।

মাটির তৃতীয় উপাদান চুণ যদি মাটিতে বেশি থাকে তাহলে গাছের পরিপুষ্টি হয় না। অবশ্য প্রয়োজনবোধে জমিতে চুণের অভাব থাকলে চুণ দিলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।

এই তিনটি পদার্থ ছাড়া মাটিতে কিছু জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন। জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি সরাসরিভাবে ও পরোক্ষভাবে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এটাই হচ্ছে দাহ্য পদার্থ। এই দাহ্য পদার্থ যদি মাটিতে না থাকে তাহলে গাছ বাড়বে না।

উৎপাদনের দিক থেকে বিচার করলে বাগানের কাজে সবচেয়ে ভাল মাটি হচ্ছে দো-আঁশ মাটি। এ জাতীয় মাটিতে ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কর্দম, ৪০ থেকে ৫০ ভাগ বালু, ৫ ভাগ চুণ ও ৫ ভাগ দাহ্য পদার্থ থাকে।

জমি প্রস্তুত করবার নিয়ম—জমি চাষ হচ্ছে জমি প্রস্তুতির প্রথম স্তর। সাধারণ শাক-সবজির জন্য মাটি দুই হাত গভীর করে চাষ করলেই ভাল। মাটি

পরে ঝুরা করতে হয়। জমি তৈরি করবার সময়ই জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয় এবং জলসেচের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

জমির সার—গাছপালা তিন রকম প্রধান খাদ্য গ্রহণ করে। এগুলি হচ্ছে (১) নাইট্রোজেন বা গাছের গঠন সহায়ক খাদ্য, (২) ফসফরাস বা গাছের ফুল ধরার সহায়ক দ্রব্য এবং (৩) পটাশ বা গাছের বিভিন্ন অংশে খাদ্য সরবরাহকারী বস্তু।

এই সমস্ত বিভিন্ন সারবস্তু আমরা বিভিন্ন বস্তু থেকে পেয়ে থাকি। সেগুলি হচ্ছে (১) উদ্ভিজ্জ সার, (২) প্রাণিজ সার, (৩) মৃত্তিকা সার (৪) খনিজ সার, (৫) মিশ্রিত সার ও (৬) রাসায়নিক সার।

(১) **উদ্ভিজ্জ সার**—গাছের ডালপালা, চা পাতা, তরকারির খোসা গর্তে রেখে জল ও চুন ছড়িয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে ভাল উদ্ভিজ্জ সার হয়। শন, ধঞ্চে প্রভৃতি পচালেও উত্তম সারে পরিণত হয়। এরূপ সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ থাকে।

(২) **প্রাণিজ সার**—অস্থি খণ্ড (bone), অস্থি চূর্ণ (bone dust) এবং গোবর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রাণিজ সার।

(৩) **মৃত্তিকা সার**—পলিমাটি, পোড়ামাটি অতি উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা সার।

(৪) **খনিজ সার**—চুণ, লবণ প্রভৃতি খনিজ সারের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

(৫) **মিশ্রিত সার**—মিশ্রিত সার সবজির ক্ষেতের পক্ষে খুবই ভাল। রান্নাঘরের তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ঘর ঝাটান ধূলা, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, পশুপাখির মৃতদেহ ইত্যাদি সংমিশ্রণে যে সার উৎপন্ন হয় তা সবজির ক্ষেতের পক্ষে খুবই ফলপ্রদ।

(৬) **রাসায়নিক সার**—রাসায়নিক সার বাজারে ক্রয় করতে পারা যায়। এদের মধ্যে নাইট্রেট অব সোডা, নাইট্রেট অব পটাশ, সালফেট অব এ্যামনিয়া, সুপার ফসফেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বীজ সংগ্রহ—ক্ষেতে বীজ বপন করবার পূর্বে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভাল বীজ সংগ্রহ করা চাই। ভাল বীজ পেলে তাহলে ভাল সবজির গাছ হবে। পুষ্ট বীজ সবজি ফলনের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

গাছ রোপণ করার নিয়ম

বাগানে গাছ লাগাতে হলে দু' ভাবে গাছ লাগান যেতে পারে—বীজ বপন করে এবং কলম করে। লাউ, কুমড়া, ডাটা, মূলো প্রভৃতির গাছ শুধু বীজ পুঁতে

বা বীজ ছড়িয়ে উৎপাদন করা যায়। পুঁততে হলেও সারিবদ্ধভাবে বীজ পুঁততে হয়। লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, আলু, শশা, পেঁয়াজ ইত্যাদি নির্দিষ্ট ফাঁক রেখে পুঁততে হয়। নটে, ডাটা ইত্যাদির বীজ ছড়িয়ে দিতে হয়। কফি, টমেটো ইত্যাদির বীজ প্রথম বীজতলায় ছড়িয়ে চারা হলে, চারা ৭।৮ সে.মি. বড় হলে তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে পুঁতে দিতে হয়, দুটি চারার মধ্যে দূরত্ব থাকবে প্রায় ৮০ সে.মি।

শাক-সবজির গাছ বেশি দিন বাঁচে না। একটি ঋতুতেই ঐগুলো শেষ হয়ে যায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি প্রভৃতি শীতকালেই শেষ হয় আবার শশা, ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স, ডাটা বর্ষার ফসল, বর্ষার পরই ওদের অস্তিত্ব আর দেখা যায় না।

গাছের কলমও লাগান যায়। ফুল যথা—গোলাপ, গন্ধরাজ; ফল যথা—আম, পেয়ারা ইত্যাদি।

শিশু পালন শিক্ষণ

শিশু জন্মানর পূর্বেই ভাবী মায়ের কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হয়। এ নিয়ম পালন ভাবী শিশুর মঙ্গলের জন্যই। ভাবী মাকে মনে রাখতে হবে যে অপর আর একটি প্রাণকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, অতএব তাঁকে নানাভাবে নিয়ম মত চলতে হবে।

ভাবী মায়ের যত্ন—প্রথমতঃ ভাবী মায়ের চাই প্রচুর বিশ্রাম। প্রয়োজন হলে তিনি ৮।৯ ঘন্টা ঘুমোবেন। কঠোর পরিশ্রমের কাজ তিনি করবেন না। তাঁর মনকে শান্ত ও প্রফুল্ল রাখতে হবে।

বিশ্রামের মত ভাবী মায়ের পক্ষে ব্যায়ামও প্রয়োজন। নিজের অভ্যাস অনুযায়ী তিনি চলাফেরা করবেন। তিনি সটান চিৎ হয়ে শুয়ে প্রথমে এক পা এবং পরে আর এক পা উপরে তুলে আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে পা দুটি মেরুদণ্ডের সমকোণ করবেন। দুটি পা একবারে নামাবেন না, একটি একটি করে নামাবেন। পা দুটি উপরে তোলার পর পা দুটি যথাসম্ভব ফাঁক করবেন আবার গুটাবেন। এরূপ ব্যায়াম করলে মাংসপেশীগুলি সবল ও নরম থাকবে এবং প্রসবের সময় কোন কষ্ট হবে না।

ভাবী মায়ের পক্ষে স্নান খুব উপকারী। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান আরম্ভ করে পরে

ঠাণ্ডা জলে গা মার্জনা করা ভাল। প্রসবের এক মাস আগে থেকে বর্বণ-স্নান বা হাঁটু গেড়ে বসে স্নান বাঞ্ছনীয়।

ভাবী মায়ের স্তনের যত্ন নিতে হয়। স্তন ভারী হলে সরিষার তেল বা বোরিক এসিড সলিউশন এবং একই পরিমাণ সুরাসার একত্র করে স্তনের বোঁটায় লাগাতে হবে। পরে শুকিয়ে গেলে সরিষার তেল গরম করে স্তনে ও বোঁটায় মাখাতে হবে।

ভাবী মায়ের পোশাক ঢিলে ঢালা, নরম ও আরামদায়ক হবে। আঁটসাট জামা তিনি ব্যবহার করবেন না।

নবজাত শিশু

শিশুর জন্মের পর ধাত্রীর প্রথম কাজ হল তেল মাখিয়ে পরে বোরিক এ্যাসিড সলিউশনে শিশুর দেহ পরিষ্কার করা। পরে শিশুর নাভি কেটে তার উপর বিশোধিত পটি বেঁধে দিতে হবে। নবজাত শিশুর নাভির পটি যাতে না ভিজে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে স্নান করাতে হবে। স্নানের পর নরম কাপড় দিয়ে তলপেটটি বেঁধে দিতে হবে।

শিশু বড় না হওয়া পর্যন্ত এবং নিজে সব কাজ করবার জন্য উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সব কাজ মাকেই করতে হবে। মায়ের কাজগুলির কথা নিম্নে আলোচনা করছি।

শিশুর স্নান—শীতল জলে স্নান করাবার পূর্বে প্রতিদিন শিশুকে রৌদ্রে ফেলে রাখা উচিত। প্রথম দিকে ২।১ মিনিট করে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত আধ ঘণ্টা পর্যন্ত শিশুকে রৌদ্রে রাখা যায়। একে সূর্যস্নান বলে। নিয়মিত সূর্য স্নান করালে শিশু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবে না এবং রিকেট রোগও হবে না। আবহাওয়ার দরুন সূর্যস্নান সম্ভব না হলে প্রতিদিন সামান্য কড লিভার অয়েল খাওয়াতে হবে। রৌদ্রস্নানের পূর্বে শিশুকে খাঁটি সরিষার তৈল মাখিয়ে দিতে হবে।

এরপরে ঠাণ্ডা জলে স্নান। এখন সাবান বা বেসম ব্যবহার করা চলে। সাবান হবে শিশুর কোমল চামড়ার উপযোগী সাবান।

স্নানের সময় মাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তিনি এক টুকরা তুলা বোরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে শিশুর চোখ মুছিয়ে দেবেন। পরে ভিন্ন তুলি নিয়ে ঐ এ্যাসিডে ডুবিয়ে শিশুর লিঙ্গ, যোনি ও মলদ্বার ভাল করে পরিষ্কার করে দেবেন। তারপর সাবান বা বেসম মাখিয়ে শিশুকে যথারীতি স্নান করাতে

হবে। শীতকাল ছাড়া শিশুকে শীতল জলে স্নান করানর অভ্যাস প্রথম থেকে করান ভাল।

স্নান হয়ে গেলে মা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বড় তোয়ালের সাহায্যে ভাল করে গা মুছিয়ে দেবেন। মুছিয়ে দেবার পর শিশুর গায়ে কিছু ট্যালকম পাউডার দেওয়া চলে।

শিশুর পোশাক—শিশুর পোশাক সব সময় হবে ঢিলে ঢালা ও হাল্‌কা রঙের। আঁটশাট পোশাকে শিশুকে সুন্দর দেখাতে পারে বটে, কিন্তু শিশু সে ভাবে থাকলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে না। রবীন্দ্রনাথ ত' শিশুকে সাত বৎসর কাল পর্যন্ত উলঙ্গ থাকতেই বলেছেন। সে যা হোক, শিশু ঢিলে ঢালা পোশাক পরবে। শিশুর পোশাকের মধ্য দিয়ে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে খালি গায়ে পশমের জামা পরান ঠিক নয়।

শিশুকে খাওয়ান—শিশুর জন্মানর প্রথম ছয় মাস মাতৃদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ খাদ্য। এই দুগ্ধ পানে শিশুই শুধু স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ হয় না, মাতার পক্ষেও এটি মঙ্গলজনক।

শিশুকে স্তন দিবার সময় স্তন দুটি ভালভাবে মুছে অদল বদল করে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। প্রথম দু মাস ৩ ঘন্টা অন্তর, ২ থেকে ৬ মাস ৩½ ঘন্টা অন্তর ৬বার এবং ছয় মাসের পর ৪ ঘন্টা পরে পরে ৫ বার মায়ের দুধ পান করাতে হবে। স্তন মুখে দিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ান উচিত নয়, আর শিশু কাঁদলেই স্তন মুখে দেওয়া অনুচিত।

শিশুর অন্যান্য খাদ্য—মা যখন রোগে ভোগেন, কিংবা তার দুধের স্বল্পতা ঘটে, কিংবা যখন তিনি চাকরী করতে বাইরে যান, কিংবা মা যদি আবার গর্ভবতী হন, তখন শিশুকে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প কৃত্রিম খাদ্য দিতে হবে।

কৃত্রিম খাদ্য

কৃত্রিম খাদ্য অর্থাৎ গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ বেশি উষ্ণ বা বেশি ঠাণ্ডা হলে চলবে না। এতদ্ব্যতীত গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ সহজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু গ্রহণ করতে পারবে না। তাকে শিশুর খাওয়ার উপযোগী করে নিতে হবে।

গোদুগ্ধ তৈরি করবার নিয়ম—খাঁটি দুধ শিশুর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। নবজাত শিশুকে যদি গোদুগ্ধ পান করান একান্তই আবশ্যক হয়, তাহলে সমপরিমাণ

জল মিশিয়ে শিশুকে খেতে দিতে হবে। অর্থাৎ ৩ আউন্স দুধে ৩ আউন্স জল দিয়ে শিশুর খাদ্য তৈরি করতে হবে। তারপর মাসখানেক পরে ধীরে ধীরে জলের মাত্রা কমাতে হবে। এভাবেই খাঁটি দুধের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে। ছয় মাসের সময় শিশুকে ৮ আউন্সের সাথে ৪ আউন্স জল দিতে হবে।

গোদুগ্ধ ছাড়াও শিশুকে অন্যান্য খাদ্য, যথা, ছাগলের দুধ, টিনের দুধ (ল্যাক্টোজেন, গ্ল্যাকশো) প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া হয়। এইসব দুগ্ধ মাতৃদুগ্ধের সমপরিমাণ শক্তিসম্পন্ন করে নিতে হয়। তার পূর্বে টিনের দুগ্ধের উপাদানের পরিমাণ জেনে নিতে হবে।

সাধারণতঃ অন্যান্য দুধ বোতলে করে খাওয়ান হয়। দুধ নেবার পূর্বে বোতলটি ও চুষনীটি পরিশোধিত করে নিতে হবে। দুধ যত্নের সঙ্গে গরম করে, মাতৃস্তনের অনুরূপ ঠাণ্ডা করে, সাবধানতার সঙ্গে বোতলে ভরে নিতে হবে। দুধ খাওয়ার সময় বোতলটি কয়েক মিনিট গরম জলে রেখে বোতলের দুধ কুসুম কুসুম গরম করে নেওয়া দরকার। মাতৃস্তন থেকে শিশু যেমন দুধ পান করে, ঠিক সেরূপভাবে বোতলটি ধরে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে।

শিশুর আহারের পরিমাণ—শিশুর আহার তার বয়স ও ওজনের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ শিশুর ওজন যত পাউণ্ড, তার ১·৭৫ গুণ আউন্স খাঁটি দুধের প্রয়োজন। শিশুর বয়স যত মাস প্রতিবারে শিশু তার চাইতে ২ আউন্স বেশি দুধ পান করতে পারে। খাঁটি দুধ ও জল মিশ্রিত হচ্ছে এই দুধ।

প্রতিবারের আহারের পরিমাণ হচ্ছে, যত মাস বয়স যোগ ২ আউন্স অর্থাৎ ৬+২=৮ আউন্স খাদ্য।

দিনের মোট প্রয়োজনের পরিমাণ ৮×৫=৪০ আঃ খাঁটি দুধ ১৫×১·৭৫= ২৬·২৫ আউন্স।

জল মিশাতে হবে ৪০−২৬·২৫=১৩·৭৫ আউন্স।

চিনির পরিমাণ ১ আউন্স।

মোট খাদ্যের পরিমাণ ৪০+১=৪১ আউন্স। এই দুধ ৫ বারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে।

শিশুকে মাই ছাড়ান—এক বৎসরের মধ্যে শিশুকে সম্পূর্ণই মাই ছাড়াতে হবে। এজন্য ২।৩ মাস বয়স থেকেই ফলের রস, সিরিয়েল (মিহি সুজি বা ফ্যারেক্স), সুজি ভাল করে সেদ্ধ করে চায়ের চামচের এক চামচ দুধের সঙ্গে মেশাতে হবে। ৬ মাস বয়সে শিশু সিরিয়েল খাবে দিনে ৬ আউন্স।

পাঁচ ছয় মাস বয়স থেকে শিশুকে শাক সবজি দিতে শুরু করা উচিত। সবজির মধ্যে পালং শাক, গাজর ও আলু উৎকৃষ্ট। সবজিগুলি ধুয়ে সিদ্ধ করে একটু লবণ দিয়ে থেঁতলে দিতে হয়। মাখন বা ঘি তাতে মোটেই থাকবে না।

এক বৎসর বয়সে শিশুকে তিন বার প্রধান খাদ্য দেওয়া হবে। মধ্যে দুবার ফলের রস, সকালের খাওয়া ও দুপুরের খাওয়ার মধ্যে একবার ফলের রস, বিকালের দিকে একবার ফলের রস এবং রাত্রিতে নৈশ ভোজন।

সকালের খাবার—এই সময় শিশুকে দুধ, সিরিয়েল ও ফল খেতে হবে। ফলের ক্ষেত্রে আপেল ও টাটকা কলা বাঞ্ছনীয়। এমন ফল দিতে হবে যাতে শিশু তার কচি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতে পারে। সিরিয়েল হিসেবে গমের রুটি খুব ভাল। সিরিয়েল সুসিদ্ধ হবার প্রয়োজন।

বেলা ৯টা থেকে ৯·৩০-এর মধ্যে শিশুকে এক টুকরা আপেল বা লেবুর সরবৎ দিতে হবে।

মধ্যাহ্নের আহার—বেলা ১২টায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, শিশুর জন্য সিরিয়েল বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, শাক সবজি দুধ থাকতে হবে। পালং শাক, পেঁয়াজ সিদ্ধ, গাজর সিদ্ধ, কড়াইশুঁটি এবং বরবটি সিদ্ধ শিশুকে খাওয়ান ভাল। ভাতের পরিমাণ কমিয়ে আলু বেশি দেওয়া চলে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকেলবেলা ৩টা নাগাদ শিশুকে টমেটো বা লেবুর রস দিতে হয়।

রাত্রির আহার—সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬·৩০-এর মধ্যে রাত্রির আহার শেষ করতে হবে। সুসিদ্ধ কোনও প্রকার সিরিয়েল ও দুধ এই সময়কার প্রধান খাদ্য।

শিশুর দাঁত ওঠা—শিশুর প্রথম দাঁত ওঠে ৬—৮ মাস বয়সের মধ্যে, পরে ধীরে ধীরে ৩২ মাসের মধ্যে শিশুর ২০টি দাঁত উঠে থাকে। এই কুড়িটি দাঁত অস্থায়ী। পরে ছয় থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে এগুলি পড়ে গিয়ে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ৩২টি দাঁত ওঠে।

শিশুর জীবনে সৎ অভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা

শিশুর জীবনে যে অভ্যাস গঠিত হয়, তা তার জীবনে চিরকাল স্থায়ী থাকে। তাই এই শৈশবকালে শিশুদের মধ্যে সৎ অভ্যাস গঠনের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবককে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হবে।

প্রথম অবস্থায় শিশুর কোন অভ্যাস নেই। শিশুর মাংসপেশীসমূহ এসময় কোমল ও নমনীয়। এই সময়ে উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা শিশুকে যেমন ইচ্ছা গঠন করে নেওয়া যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে শিশুর গৃহের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিশু গৃহে যা দেখবে তাই সে করবে। গৃহের পরিবেশ যদি এমনি হয় যেখানে সকলে স্বাস্থ্যসম্মত রূপে বাস করে, সত্য কথা বলে, কোন অনাচার করে না, তাহলে শিশুও সেইভাবে সেই অভ্যাসগুলিতে বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু গৃহের পরিবেশ যদি শিশুর সু-অভ্যাস গঠনের পক্ষে অনুকূল না হয়, সে কিছুতেই সু-অভ্যাসমুখী হবে না। শিশু যদি গৃহস্বামীকে প্রতিদিন বেলা ৮টার সময় ঘুম থেকে উঠতে দেখে, তাহলে তাকে কি ভাবে ৬টার আগে শয্যাত্যাগ করতে প্রভাবিত করা যাবে? অতএব শিশুর সু-অভ্যাস গঠন করতে হলে গৃহের পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে।

তবু কয়েকটি কথা শিশুদের সু-অভ্যাস গঠনের সম্পর্কে বলতে হবে।

শিশুর উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস—খাওয়ার ভিতরে শিশুর রুচির প্রশ্ন এলেই শিশু খাওয়া বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণে কু-অভ্যাস গঠিত হতে দেখা যায়। প্রথম দিক থেকেই গৃহের পরিবারের লোকেরা বিশেষ করে মা দৃঢ়তার সঙ্গে, শিশুর খাওয়ার ব্যাপারে সু-অভ্যাস গঠন করতে শিক্ষা দেবেন।

মনে রাখতে হবে যে শিশু অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় জীব। যে খাদ্য শিশু খেতে চায় না তা যদি বাড়ির লোকেরা নিয়মিত খায়, তাহলে সেদিকে সে আকৃষ্ট হবে। ধীরে ধীরে তার অভ্যাসের মোড় ফিরবে। জননীর হাবভাব এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা যে খাদ্য পছন্দ করেন না, অথচ শিশুকে খাওয়াতে চান এবং ফলাও করে বলেন যে তার সেই খাদ্য শিশুবয়সে গ্রহণীয় ছিল না, তাহলে শিশুও মাতার উক্তি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হবে, এবং শিশু সে সব জিনিস খেতে চাইবে না।

খাদ্যের কোন একটি পদ যদি শিশু খেতে না চায় এবং সেই খাদ্য যদি শিশু-শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাহলে সে খাদ্য শিশু যদি না খেয়ে তার পরিবর্ত চায় —তাহলে মাকে সে বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় হতে হবে। সে যদি কিছু না খায়, না খাক, কিন্তু তবু তার কাছে নতি স্বীকার করে অন্য খাদ্যের ডিস দিতে হবে না। তাকে এক গ্লাস লেবুর সরবৎ খাইয়ে রাখ। পরবর্তী খাদ্য গ্রহণের

সময়েও তাকে সেই জাতীয় পদ দিয়েই খেতে হবে। পুনরায় খেতে অস্বীকার করলেও তার ভাগ্যে সেই লেবুর রস। পরবর্তী খাদ্য গ্রহণের সময়ও ঐ এক পদ। ক্ষুধিত শিশু আর কদিন প্রতিরোধ করবে? এদিকে অন্যেরা যদি সে খাদ্য তৃপ্তি সহকারে খায় তাহলে সেও তা খেতে চাইবে।

শিশুকে সাদামাঠা খাবার খেতে দিতে অভ্যাস করাতে হবে। খাদ্যের সঙ্গে জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিশুকে চিবিয়ে খেতে সর্বদা উৎসাহ দিতে হবে। তাড়াতাড়ি খেলে চিবান হয় না। তাই শিশু সময় নিয়ে চিবিয়ে খেতে শিক্ষা করবে।

শিশুর বারে বারে খাওয়া বন্ধ করতে হবে। যে কবার খাওয়া দিনে নির্দিষ্ট থাকবে, তার বেশি শিশু খাবে না। পাকস্থলীরও বিশ্রাম দরকার।

ঘুমাবার অভ্যাস—যথা সময়ে ঘুমান একটি প্রয়োজনীয় সু-অভ্যাস। যারা শৈশবে যথোপযুক্ত নিদ্রার অভ্যাস করে নি, তারা সামান্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেই নিদ্রাহীনতা রোগের খপ্পরে পড়ে। মা শিশুকে ঘুমুতে যাবার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন এবং তখন শিশুকে তিনি একলা রেখে চলে যাবেন, তাহলেই শিশুর নিদ্রার অভ্যাস গঠিত হবে।

মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস—শৈশবই হচ্ছে উপযুক্ত অভ্যাস গঠনের সময়। অল্প বয়স থেকেই মা শিশুকে যথা সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে শেখাবেন। একবার অভ্যাস গঠিত হলে, শিশু যথাসময়ে মলমূত্র ত্যাগ করবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস—শিশুকে প্রথম অবস্থা থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করিয়ে দিতে হবে। প্রথমে তারা শিখবে খাদ্য-দ্রব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা, তারপর সেই অভিজ্ঞতাই তারা দেহের উপর, পোশাক-পরিচ্ছদের উপর এবং বাইরের অন্যান্য জিনিসের উপর প্রয়োগ করবে।

ব্যায়ামের অভ্যাস—দেহ কার্যক্ষম রাখবার জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রাম দরকার, সেইরূপ শিশুদের শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম কর্তব্য। শিশুরা উন্মুক্ত মাঠে গিয়ে খেলাধূলা করবে। ছোটো শিশুদের শুধু কোলে কোলে না রেখে তাদের খেলার আগ্রহ জন্মিয়ে দিতে হবে।

মানুষের জীবনে বিভিন্ন স্তর

রুশো (Rousseau) মানুষের যুবাকাল পর্যন্ত সময়কে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন জন্ম থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের শৈশবকাল, পাঁচ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত বাল্যকাল, বার থেকে ১৫ বৎসর কাল হচ্ছে কৈশোর এবং ১৫ থেকে ২২ বৎসর পর্যন্ত হচ্ছে যুবা।

আমরা এখানে শিশুর বাল্যকাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ; অতএব ঐ পর্যন্তই আমাদের আলোচনা সংক্ষেপে নিবদ্ধ থাকবে।

শিশুর শৈশবকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার **দৈহিক বৃদ্ধি**। দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবকালে হয়ে থাকে। এক মাসের মধ্যে শিশু মাথা তুলতে পারে, পাঁচ মাসের মুখে শিশু ঠেসান দিয়ে বসতে পারে, দাঁড়াতে পারে আট নয় মাস বয়সে, ঐ সময়েই প্রায় সে হামাগুড়ি দিতে পারে এবং এক বছরের মাথায়ই সে হাঁটতে পারে, দেড় বৎসরে শিশু দৌড়তে পারে।

দৈহিক বৃদ্ধি যেমন শিশুর হয়, তেমনি তার কথা বলার শক্তি বৃদ্ধি পায়। চারদিকে সকলের কথা শুনে এবং শিশুর প্রতি বড়দের Command বা আদেশ শুনে (এটা কর, ওটা কর, বস, দাঁড়াও, খাও) শিশু ধীরে ধীরে অনেক কথা শিখে ফেলে। কোন বয়সে শিশু কত শব্দ শিখতে পারে তার একটা হিসেব জানা গেছে। শিশু ২ বৎসরের শেষে ২৭২টি ও ৩ বৎসরের শেষে ৮৯৬টি শব্দ পরিবেশ থেকে শিখে ফেলে।

মানব শিশু প্রথম থেকে তার সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হলেও সে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলতে শিখবে। কিন্তু ইতর প্রাণী শুধু সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলে।

শিশু চার বৎসর বয়স থেকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সে চায় যে সকলেই তার আদেশ পালন করুক। পিতামাতার উপর তার একাধিপত্য হলেই ভাল, এই তার মনোভাব। সে ছোট ভাইবোনদের হিংসা করে।

এর কিছু পরে থেকেই শিশু অন্তর্মুখী হয়। সে তখন বাইরের লোককে তার জীবন থেকে বাদ দিয়ে যায়। পরে তার মনে আত্মপ্রসারের অবস্থা জাগ্রত হয় এবং সে বাইরে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কিন্তু রূঢ় জগতের কাছে প্রতি-হত হয়। ফলে তার মনে আবার আত্মবিলোপের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। দুই এর মধ্যে অর্থাৎ আত্মবিলোপ ও আত্মপ্রসারের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, তখন শিশু

বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে টেনে এনে কল্পনার জগতে স্থাপন করে। এখানে সে যথেচ্ছভাবে আত্মপ্রসারের সুযোগ পেয়ে থাকে। কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে সে হয় সব কিছুর নায়ক বা স্রষ্টা কিংবা দুঃখী, সকলের সমবেদনা জাগ্রতকারী। শিশুর এ জাতীয় খেলাকে তার **কল্পনা বিলাসের** বা make believe এর খেলা বলা হয়ে থাকে।

অনুকরণের (Immitation) মনোভাব তিন বৎসর পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে খুব প্রবল দেখা যায়। সে অপরকে যা করতে দেখে তাই সে করে। খেলাধুলা, পড়াশুনা ইত্যাদি সবই অনুকরণ প্রবৃত্তির ফল।

অনুকরণ আবার দু'রকমের, অজ্ঞাত বা নির্জ্ঞান মনের অনুকরণ এবং অপরটি হচ্ছে সজ্ঞাত অনুকরণ। এর প্রথমটি হচ্ছে নীচু স্তরের ও পরেরটি হচ্ছে উঁচু স্তরের অনুকরণ। একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একটি শিশু যখন স্কুলের ছুটির পর দৌড়ে বাড়ির দিকে চলে, তখন দেখাদেখি আর একটি শিশুও হয়ত তাই করে। এই অনুকরণ নিম্নস্তরের বা অজ্ঞাত অনুকরণ। কিন্তু যখন একটি ছোট বালিকা তার বড় বোনকে নৃত্য করতে দেখে নাচের অনুকরণ করে, তখন সে তার বোনের আদর্শকে গ্রহণ করে তার অনুকরণ করে। এটা উচ্চস্তরের সজ্ঞান অনুকরণ। Nunn সাহেব এরূপ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে ছোট মেয়েটি ভাল করে অনুকরণ করতে না পারলেও ক্রমশঃ সে তা করতে পারবে। এখানে কিছুটা চিন্তা রয়েছে।

অনুকরণের সাথে ইঙ্গিতের (Suggestions) এর সম্পর্ক আছে। একজনের চিন্তাধারা অপরে প্রভাবিত হতে পারে। ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাভাজন হন বা শিক্ষক পর্যায়ের হন, তাহলে শিশুরা তাঁর ইঙ্গিত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

আর এক প্রকারের ইঙ্গিত আছে তাকে বলে Contra Suggestion বা বিরুদ্ধ ইঙ্গিত। অনেক শিশুকে যা করতে বলা হয় তা সে করে না। তার বিপরীতটি করে। কোন শিশুকে স্নান করতে বলা হলে, সে কিছুতেই স্নান করল না। আবার শরীর খারাপ বলে শিশুকে স্নান করতে মানা করা হল, শিশু ঝুপ করে পুকুরে ডুব দিয়ে এল।

শিশুর আবেগজনিত বিকাশ

শিশু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যেই শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এগুলিই হচ্ছে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)। এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ বা প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাকডুগ্যাল সাহেব যে চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও তার আবেগের কথা বলেছেন, তার তালিকা পাশে দেওয়া হল।

বৃত্তি	আবেগ
অর্জন	অধিকার বোধ
আবেদন	দুঃখ
আহার অন্বেষণ	খাদ্যলোভ
ঔৎসুক্য	বিস্ময়
গঠন	সৃজনবোধ
যুযুৎসা	ক্রোধ
পলায়ন	ভয়
যৌথভাব	একাকীত্ববোধ
সঙ্গম	লালসা
আত্মবিস্তার	আত্মবোধ
আত্মসঙ্কোচ	আত্মবিলোপ
জনকভাব	বাৎসল্য
হাসি	আমোদ
বিতৃষ্ণা	বিরাগ

শিশুর জীবনে তীব্র আবেগ দেখা যায়, কিন্তু তীব্র আবেগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। একটি শিশু কাঁদছে, আবার পরক্ষণেই দেখা গেল সে হাসছে। শিশুর আবেগের প্রকাশ খুব ঘন ঘন হয়। শিশুর আবেগের প্রতিফলন তার বাহ্য আচরণে প্রতিফলিত হয়। শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের আবেগ প্রকাশ না করে আঙ্গুল চোষা, তোতলামি, জেদ, আহারে অরুচি ইত্যাদি দ্বারা তারা তাদের অবরুদ্ধ আবেগের প্রকাশ করে থাকে। শিশুদের আবেগগুলিকে বা প্রক্ষোভগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর প্রক্ষোভগুলি হচ্ছে কৌতূহল, আনন্দ, সুখ ও স্নেহ ইত্যাদি। এই আবেগসমূহ শিশুকে সমাজে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। ক্রোধ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি হচ্ছে নেতিবাচক আবেগ। এগুলিও শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ উদ্বেগ, ক্রোধ ইত্যাদি শিশুকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। এখানে একটি কথা বলা ভাল। ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা—এই তিনটি প্রাথমিক আবেগও শিশুর জন্মের সময় দেখা যায় না। শিশু যতই অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভগুলি বিকশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে

শিক্ষকের ও অভিভাবকের তীব্র দৃষ্টি শিশুর উপর রাখতে হবে। তাঁরা শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবেন। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকের পক্ষে শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলির প্যাটার্ন জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শিশুর বুদ্ধির বিকাশ

শিশুকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আগে শিশুয় বুদ্ধির স্তর নিরূপণ করা হত। কিন্তু সেটা যথার্থ পদ্ধতি ছিল, একথা বলা চলে না। অবশ্য শিশুর কার্যকলাপ ও তার প্রতিক্রিয়া দেখে শিশুর বুদ্ধি সম্পর্ক কিছুটা বলা যায়। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা আবিষ্কৃত হবার পর আর সন্দেহ-দ্বিধা করার প্রয়োজন নেই। যেসব শিশু লিখতে পড়তে পারে না, তাদের জন্য 'কর্ম-সম্পাদন পরীক্ষা' (Performance Test) এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে শিশু বুদ্ধির কোন স্তরে আছে তা বলতে পারা যায়।

শিশু পর্যবেক্ষণ

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, শিশু-পর্যবেক্ষণ শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যকরী। শিশুরা নানা রোগে ভোগে—উপযুক্ত খাদ্যাভাব, রিকেট, এডিনয়েড ও মাংসগ্রন্থির রোগ, নাক, কান ও চোখের ব্যাধি ইত্যাদি। এগুলি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই শুধু ধরা পড়ে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকের শিশু পর্যবেক্ষণ অবশ্য কর্তব্য।

শিশুর সামাজিক বিকাশ

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথেই সামাজিকতাবোধ বৃদ্ধি পায়। সমাজ জীবনের বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হলে শিশুর সামাজিকতা বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জন্মের সময়ই শিশু সামাজিক থাকে না। শিশু যখন বস্তু ও ব্যক্তিকে পৃথক করে চিনতে পারে, তখন থেকেই তার সমাজ চেতনা আরম্ভ হয়। শিশুর জন্মের পর থেকে তার দেড় মাস বয়স পর্যন্ত শিশু অসামাজিক থাকে। দ্বিতীয় মাসে সে মানুষ চিনতে পারে, পরের মাসে সে মানুষ দেখলে খুশি হয়—এ সময় থেকেই তার সমাজ চেতনা আরম্ভ।

শিশু চতুর্থ মাস থেকে পরের ক্রোধ ও খুশি ভাব বুঝতে পারে। তাকে আদর করে ভুলান যায়, সে কণ্ঠস্বরের তারতম্য বোঝে, ষষ্ঠ মাসে শিশু কোলে চড়ার জন্য হাত বাড়ায়। প্রীতি ও বিদ্বেষ ভাব তখন থেকেই জাগ্রত হয়। দশম মাসে শিশু অপরের হাবভাব নকল করে। তার কাজের প্রশংসা করলে সে সেই কাজের পুনরাবৃত্তি করে। এক বৎসরের সময় শিশু নিজেই পোশাক পরতে চেষ্টা করে। এইভাবে শিশু ক্রমশঃ সামাজিক হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সামাজিক ও অসামাজিক মনোবৃত্তির বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের মধ্যে লজ্জা, ক্রোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ইত্যাদি দেখা যায়। এর মূলে আছে শারীরিক অস্বাস্থ্যহীনতা ও বিদ্যালয় ও সমাজের অনিষ্টকর পরিবেশ। শিক্ষক ও অভিভাবক এ সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা খুব যত্ন করে লক্ষ্য করবেন এবং সামাজিকতাবোধ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করবেন। দলগত খেলা, দলগত কাজ বিভিন্ন অনিষ্টকর প্রক্ষোভ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে।

শিশুর খেলা—খেলা শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খেলা কি? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। পূর্বে অনেক পণ্ডিতই খেলাতে সময় নষ্ট হয় বলে মনে করতেন। তাঁরা বলতেন খেলা দ্বারা কোনও মঙ্গলজনক কাজ অনুষ্ঠিত হয় না এবং খেলা ও কাজ উভয়ই পৃথক।

বর্তমান যুগের লেখক ও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। তাঁদের মতে খেলা ও কাজ দুটি আলাদা বিষয় নয়। কোনও একটি কর্মসম্পাদন খেলা না কর্ম তা স্থির করা হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। খেলা হচ্ছে আনন্দজনক, সুস্থ শিশুকে খেলার জন্য তাগিদ দিতে হয় না। খেলার মধ্যে স্বাধীনতা বর্তমান। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যাবলী ধীরে ধীরে দলীয় খেলার রূপ নেয়।

খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে।

(১) **অতিরিক্ত শক্তিতত্ত্ব** (The Surplus energy theory)

শিশু খেলার মধ্য দিয়ে তার যে শক্তির প্রয়োজন নেই তাই সে খেলার মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ করে। এই তত্ত্বকে Schiller-Spencer theory বলে।

(২) **ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব**—(The Preparation for future activities) শিশুর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত, সে কিভাবে গড়ে উঠবে বলা যায় না। তাই সে তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী খেলার মাধ্যমে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে

বিভিন্ন ধরনের কাজ করে এবং সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়, এই তত্ত্বটির উদ্ভাবক হচ্ছেন মেল ব্র্যাঞ্চ ও কার্লগ্রুস।

(৩) **পুনারাবৃত্তি তত্ত্ব** (The Recapitulation theroy) শিশু খেলার মধ্য দিয়ে মানবজাতির অনুষ্ঠিত কর্মাদির পুনরাবৃত্তি করে বলে জি, স্টানলি হল (G. Stanley Hall) বলেছেন।

(৪) **বিরেচন তত্ত্ব** (The Cathartic theory)—এই তত্ত্বের সমর্থক হচ্ছেন ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডপন্থীরা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার সব রকমের অবদমিত ইচ্ছা, সমস্ত রকমের জটিলতা যা সমাজের অনুশাসনের জন্য যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ সম্ভব নয়, তা প্রকাশ করে থাকে।

(৫) **প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব** (Rivalry theory)

ম্যাকডুগাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাঁর মত অনুসারে শিশু তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। এই তত্ত্বটিকে বিরেচন তত্ত্বের অংশ বললেও ভুল হয় না।

(৬) **নবায়ণ তত্ত্ব** (The Recreation theory)

ল্যাজেরাসের এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু তার ব্যয়িত শক্তি এবং ভগ্নোৎসাহ খেলার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শিশুর জীবনে খেলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ শিশুকে খেলতে দেবেন এবং খেলাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবেন।

শিশুপালনের ট্রেনিং

শিশুপালনের ট্রেনিং গ্রহণ করবে মেয়েরা। বলা বাহুল্য এই ট্রেনিং ছাত্রদের জন্য নয়। কিন্তু ছাত্রীরা শুধু তত্ত্ব হিসেবে বই পড়ে বিষয়টি জানলেই শিক্ষা সুফলপ্রদ হবে না। এর জন্য চাই হাতে-কলমে কাজ।

প্রত্যেক গ্রামেই আশা করি একটি প্রসূতি সদন গড়ে উঠছে বা উঠবে। গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, যারা শিশুপালন তাদের কর্মশিক্ষার অংশ হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা ঐ মাতৃসদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। প্রয়োজন হলেই তারা সেখানে গিয়ে কাজ করবে, কাজ শিখবে। এই ছাত্রীরা তাদের উত্তর জীবনে নার্স বা সেবিকা হতে পারে। এই শিক্ষা তাদের অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া মাতৃসদন থেকে ছাড়া পেয়ে মায়েরা শিশুসহ বাড়ীতেই যাবে। ছাত্রীরা তাদের follow-up work সেখানে গিয়েও করতে পারে।

গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে কোন কোন স্থানে নার্সারি বিদ্যালয়ও আছে। নার্সারি বিদ্যালয়ে এসব ছাত্রীরা যদি হাতে কলমে শিশুদের খেলাধূলা করান, খাওয়ান, পোশাক পরান, ঘুম পাড়ান ইত্যাদি কাজ করে, তাহলে তাদের হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ হবে। এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কার্যকরী অভিজ্ঞতা। চাকুরী বা স্বাধীন ব্যবসাতে ছাত্রীরা এই অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হবে।

রন্ধন শিল্প

রন্ধন শিল্প সমন্ধে পূর্ণ আলোচনা করবার প্রাক্কালে আমরা রান্না করবার জন্য কিভাবে তাপশক্তি সঞ্চারিত করব, সে বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করে নিচ্ছি, পরে আমরা কয়েকটি বাসন-পত্রের কথা উল্লেখ করে, প্রত্যক্ষভাবে রন্ধন শিল্পে আসব।

রন্ধনের জন্য তাপশক্তি

আমরা রান্নার জন্য যেসব পদার্থ জ্বালিয়ে তাপশক্তি সৃষ্টি করি তাকে জ্বালানি বা fuel বলা হয়ে থাকে। জ্বালানিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। কঠিন, তরল, গ্যাসীয় এবং বিদ্যুৎশক্তি।

কঠিন জ্বালানি—আমাদের দেশে আগে কঠিন জ্বালানি ছাড়া অন্য ধরনের কোন জ্বালানিই ছিল না। তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানি হালে আমদানী করা হয়েছে মাত্র। কাঠই ছিল আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত জ্বালানি। কাঠের আগুন সহজে নিয়ন্ত্রণ করা চলে, এটি এর একটি বিশেষ সুবিধা। কিন্তু এতে রান্নাঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়ে যায়।

কাঠের পর আসে কয়লা। কিন্তু কয়লা খুব বেশিদিন যাবৎ প্রচলিত হয়নি বলা চলে। কয়লার প্রচলন শহরেই বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে কয়লা গ্রামেও এসে ভালভাবে প্রবেশ করেছে। কারণ কয়লা দামে সস্তা। কিন্তু কয়লার আগুন কাঠের আগুনের মত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কয়লা ছাড়া, গুল, ঘুঁটে, শুকনো ঘাস-পাতাও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তরল জ্বালানি—কেরোসিন তেল, স্পিরিট, পেট্রোল প্রভৃতি হচ্ছে তরল

জ্বালানি। এগুলি থেকে তাপশক্তি সৃষ্টি যে অত্যন্ত হালের ব্যাপার সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেটাও ব্যবহার করতে হলে কেরোসিনের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু স্টোভও সেদিন মাত্র আবিষ্কার হয়েছে।

গ্যাসের জ্বালানি—বর্তমানে রান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবহার খুব হচ্ছে। উন্নতদেশসমূহে ত গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি। আমাদের দেশেও গ্যাস প্রচুর ভাবে চলছে। এতে খরচ প্রথমে বেশি হলেও, পরে এর খরচ তত বেশি হয় না। তবে সাধারণ লোকের আওতার বাইরে গ্যাসীয় জ্বালানি। এতে দুটি সুবিধা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

বিদ্যুতের জ্বালানি—কয়লা পুড়িয়ে সাধারণতঃ বিদ্যুৎ তৈরি করতে হয়। এই বিদ্যুৎশক্তিকেও রান্নার কাজে লাগান হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারেও রান্নাঘর পরিষ্কার থাকে, কিন্তু বিদ্যুৎও ব্যয়বহুল।

জ্বালানি যেমন কয়েক রকমের আছে তেমনি ঐসব জ্বালানি ব্যবহারের জন্য নানা ধরণের চুল্লীও আছে, সেগুলি হচ্ছে কাঠের চুল্লী, কয়লার চুল্লী, নানা ধরনের স্টোভ, গ্যাসীয় চুল্লী এবং বৈদ্যুতিক চুল্লী।

চুল্লী

কাঠ ও কয়লার চুল্লী—এই দুই রকমের চুল্লীরই তিনটি অংশ রয়েছে—চুল্লীর তলদেশ, চুল্লীগর্ভ এবং চুল্লীমুখ।

কাঠের চুল্লীর নীচের দিকে কাঠ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং আগুন জ্বালান হয়। ছাই জমা হয় চুল্লীগর্ভে। কয়লার চুল্লী অবশ্য আলাদা ধরনের। কয়লার চুল্লীগর্ভে কয়টি লোহার শলাকার উপরে কয়লা সাজান থাকে। কয়লার চুল্লী রান্নাঘরের মেঝেতেও করা হয়। আবার বালতি কেটেও এই চুল্লী তৈরি করা যেতে পারে। কয়লার চুল্লী চারদিক ঢাকা থাকে এবং লৌহ শলাকার নীচেই একটি ফাঁকা জায়গা থাকে, সেখান দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে এবং সেখানে ছাই জমা হতে পারে।

স্টোভ—স্টোভ জ্বালাতে হলে কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয়। স্টোভও দু রকমের হয়। এক রকম হচ্ছে প্রেসার স্টোভ। এই জাতীয় স্টোভের অন্তর্গত হচ্ছে প্রাইমাস স্টোভ। প্রাইমাস স্টোভে পাম্প দিলে কেরোসিন তেল থেকে গ্যাস

সৃষ্টি হয়, এবং ঐ গ্যাসেই তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রাইমাস স্টোভের উপরের দিকে একটি আধার থাকে, সেখানে মেথিলেটেড স্পিরিট রাখা হয়। সেখানে আগুন জালিয়ে এবং পাম্প করে কেরোসিন তেল থেকে গ্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু প্রাইমাস স্টোভে অতিরিক্ত পাম্প দিলে ফেটে যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে এরূপে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অন্য ধরনের স্টোভ হচ্ছে ব্লু-ফ্লেম স্টোভ। এর জ্বালানিও কেরোসিন তেল। বর্তমানে সলিতা বিশিষ্ট এ জাতীয় স্টোভের খুব বেশি প্রচলন। জনতা, প্রভাকর ইত্যাদি স্টোভ এই জাতীয়। কেরোসিন তেলে ভিজান সলিতা থেকেই স্টোভে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্ট হয়।

গ্যাসীয় চুল্লী—গ্যাসীয় চুল্লী ভারতের বড় বড় শহরেই আছে। অন্যান্য জ্বালানির অভাবে গ্যাসীয় চুল্লীর ব্যবহার ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। বর্তমানে সিলিণ্ডারে করে গ্যাস বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইনডেন (Indane) ও বারসেন (Bursane) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিলিণ্ডারের গ্যাস যখন ফুরিয়ে যায় তখন ঐ সিলিণ্ডার পুনরায় কোম্পানী থেকে গ্যাস ভর্তি করে আনা যায়। গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়, বিশেষ করে রান্না হয়ে গেলে চাবিটি ভাল করে বন্ধ করে রাখতে হয়। না হলে দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব। গ্যাসের উনুন সহজে ধরান ও নিভান যায়। গ্যাসের চুল্লীতে রান্নাঘর ঝুলে ভর্তি হয় না।

বৈদ্যুতিক চুল্লী—ইলেকট্রিক স্টোভের বর্তমানে বেশ প্রচলন হয়েছে। ইলেকট্রিক স্টোভ চুল্লীর চাবি রান্না শেষ হবার আগেই বন্ধ করে দেওয়া বিধেয়। কারণ চাবি বন্ধ করলেও ঐ জাতীয় স্টোভ বা চুল্লীতে অনেকক্ষণ উত্তাপ থেকে যায়। এর সুবিধা হচ্ছে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়, রান্নাঘরে কালি ঝুলির সৃষ্টি হয় না, তবে অসাবধান হলে শক লাগতে পারে।

রান্না করবার পাত্র—এ বিষয়ে বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রাম দেশেও আগে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না হত, অন্যান্য তরিতরকারী মাছ ইত্যাদি রান্না হত। মাটির কড়াতে। মাটির পাত্রে রান্না করা ভাল, মাটির পাত্রে রান্না করা খাদ্য ভাল থাকে, নষ্ট হয়ে যায় না। তবে মুশকিল হচ্ছে মাটির পাত্র তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়। এ্যালুমিনিয়মের পাত্রগুলি হালকা হলেও টেকসই। এই জাতীয় পাত্র এখন রান্নার কাজে বেশী ব্যবহার করা হয়। লোহার পাত্র ভারী বলে, লোহার

কড়াই এখন অনেকে ব্যবহার করতে চান না। তবে লোহার জিনিসের মধ্যে রুটি তৈরি করবার চাটু, বেড়ি ও সাঁড়াশি বহুল প্রচলিত।

এনামেল পাত্রে রান্না করা যায় না, খাদ্যদ্রব্য রাখা চলে বটে, কিন্তু এনামেলের প্রলেপ উঠে গেলে, সেখানে খাদ্যদ্রব্য রাখা ঠিক নয়। কারণ তাতে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে।

পিতল কাঁসার বাসন একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তার ব্যবহার কমে গেছে। কাঁসার পাত্রে অম্ল অনেকক্ষণ রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমানে স্টেনলেস স্টীল ও হিণ্ডালিয়ামের নানা ধরনের বাসন তৈরি হচ্ছে। স্টেনলেস স্টীলের বাসনের দাম খুব বেশি।

রন্ধন

আজ আমরা রান্না করে খাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষরাই রাঁধতে জানত না, তখন খাদ্যদ্রব্যাদি তারা কাঁচা অবস্থাতেই ভক্ষণ করত। এমনি অবস্থায় বহু বৎসর চলেছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার হল আগুন। প্রাচীন মানুষেরা ভাবল কাঁচা জিনিসগুলোকে একটু আগুনে পুড়িয়ে নিলে কেমন হয় দেখা যাক। দেখা গেল খেতে ভালই হয়েছে। এমন করে ক্রমে ক্রমে মানুষ আগুন জ্বালিয়ে রান্না করতে শিখল। তারা ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করল রান্না করবার পদ্ধতি। শিখল মশলা সংযুক্ত রান্না। বলা বাহুল্য মানুষের বর্তমান রান্নার ব্যবস্থায় আসতে বহুদিন কেটে গিয়েছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বাসন-কোসনের বৃদ্ধি পেয়েছে। নানারকম রান্না করবার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে রান্নার প্রয়োজনের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় আমরা কোন কোন জিনিস কাঁচা খাই বটে, কিন্তু কোন কোন জিনিস আমরা কাঁচা খেতে মোটেই পারি না, অথচ মশলা সংযুক্ত হয়ে রান্না হলেই আমরা ঐ জিনিসগুলি মহানন্দে খেয়ে থাকি। মাছ মাংস আমরা রান্না না করে খেতেই পারি না।

এছাড়া এমন সব খাদ্য আছে যেগুলি রান্না করতেই হয়, রান্না না করলে আমাদের পরিপাক ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। কাঁচা অবস্থায় তরকারির গুণগুলি আমরা পরিপাক করে উঠতে পারি না। অথচ ঐগুলিই যদি সুসিদ্ধ হয় তাহলে ঐ তন্তুসমূহ নরম হবে এবং আমাদের পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করবে।

রান্নার অপর প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণু মুক্ত করে রাখা। খাদ্য-দ্রব্যাদি জীবাণু মুক্ত থাকলেই শরীর সুস্থ থাকে। অনেক কাঁচা খাদ্যদ্রব্যেই স্বভাবতঃ অসংখ্য জীবাণুতে পরিপূর্ণ। এসব জীবাণু পেটে গেলে কঠিন রোগ হতে পারে। কিন্তু জিনিসগুলি যদি সুসিদ্ধ হয় তাহলে ঐ জীবাণু কখনই আর বেঁচে থাকতে পারবে না এবং অসুখও সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধ, কিন্তু অনেক সময়েই এই দুধ টাইফয়েড ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণুবাহক হয়। কাঁচা দুধ পান করলে ঐসব রোগের ভয় থাকতে পারে। কিন্তু দুধ যদি ভাল করে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহলে ঐসব জীবাণু আর বেঁচে থাকতে পারবে না। তখন ঐ দুধ অনায়াসে খেতে পারা যাবে।

রন্ধন পদ্ধতি—রন্ধন করবার প্রক্রিয়াকে মোটামুটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) ঝলসান (Roasting)
(২) মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing)
(৩) তাপে সিদ্ধ করা (Steaming)
(৪) ফুটিয়ে সিদ্ধ করা (Boiling)
(৫) সেঁকা (Baking)
(৬) ভাজা (Frying)

(১) **ঝলসান** (Roasting)—আদিম যুগের মানুষ যখন প্রথম আগুন আবিষ্কার করে আগুনকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে লাগাল তখন ঝলসান ছিল রান্নার একমাত্র পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে প্রথম অবস্থাতেই বাইরের অংশে দ্রুত তাপের সাহায্যে অর্ধদগ্ধ করে নেওয়া হয়। এভাবে পোড়ালে উপরের অংশের অ্যালবুমেন জমে কঠিন হয়। ফলে ভিতরের সার পদার্থের আর অপচয় হয় না। পরে কম আঁচে খাদ্যদ্রব্যটি যদি বসান যায় তাহলে ধীরে ধীরে ভিতরের অংশ গরম হয়ে নরম হয়ে যাবে। বেগুন পোড়া, মিষ্ট আলু পোড়া, শোলমাছ পোড়া, শিক কাবাব ঝলসান পদ্ধতিতে রান্না করা হয়।

(২) **মৃদু তাপে সিদ্ধ করা** (Stewing)—রন্ধনের এই প্রক্রিয়ায় মৃদু আঁচে ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। জল ফুটাতে হয় না, অর্থাৎ ১০০° সেলসিয়াসের উপরে বৃদ্ধি ত করা হবেই না, নীচে ৮২°—৮৫ সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেই ভাল। মৃদু তাপে সিদ্ধ করলে খাদ্যবস্তুর প্রোটিন কখনও কঠিন হয়ে যাবে না। ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজপাচ্য হবে।

(৩) **ভাপে সিদ্ধ করা** (Steaming)

রন্ধনের এই প্রক্রিয়ায় জল ফুটিয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে খাদ্যবস্তু সিদ্ধ করতে হয়। একে ভাপে সিদ্ধ করা বলে। ভাপে সিদ্ধ করতে হলে ইকমিক কুকারে রান্না কয়ার প্রক্রিয়াই সবচেয়ে ভাল। ইকমিক কুকারে ছোটো ছোটো বাটি থাকে এবং ঐগুলিতে একটি আঁট পাত্র ঢাকনা হিসাব উপরে লাগান হয়। সবচেয়ে নীচের বাটিতে ফুটন্ত জলের তাপ লাগে এবং সমস্ত বাটিগুলি বন্ধ অবস্থায় বাষ্পের তাপ পায়। এরূপ করার ফলে বাটির মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্যগুলি ধীরে ধীরে উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়, খাদ্যদ্রব্যসমূহ বাষ্প দ্বারা পরিবৃত থাকে বলে অক্সিজেন দ্বারা ভাইটামিনসমূহ নষ্ট হয় না। ডাল, ভাত, মাছ, মাংস ইত্যাদি ভাপে সিদ্ধ করলে বেশ ভাল হয়। আজকাল প্রেসার কুকারেও একইভাবে রান্না হয়। প্রেসার কুকার ইকমিক কুকারের উন্নততর সংস্করণ, এতে খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়।

(৪) **ফুটিয়ে সিদ্ধ করা** (Boiling)—রান্নার এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ ১০০° সেলসিয়াস এ ফুটিয়ে নিতে হয়। একেই বলা হয় ফুটিয়ে সিদ্ধ করা। ভাত, ডাল, মাছ ইত্যাদি ফুটিয়েই রান্না করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে তাপ সর্বত্র সমানভাবে পরিচালিত হতে পারে। জলের মধ্যে খাদ্যবস্তু সিদ্ধ হয় বলে পুড়ে যাবার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রান্না করবার একটি অসুবিধা আছে। কোন খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করার পর যদি জল ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে খাদ্যের সারবস্তু চলে যাবে! ভাতের ফেন ফেললে ভাতের সারবস্তু নষ্ট হয়ে যায়।

(৫) **সেঁকা** (Baking)—সেঁকা মানে শুকনো তাপে রান্না করা। এই প্রক্রিয়াটি ঝলসানো প্রক্রিয়ারই নামান্তর ছাড়া কিছু নয়। ঝলসানোতে খাদ্য-বস্তুর মধ্যে সরাসরি উত্তাপ লাগে কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুর মধ্যে পরোক্ষভাবে তাপ লাগান হয়। চাপাটি ও আটার রুটি এই ভাবেই সেঁকা হয়। তাছাড়া রুটি বানানোর জন্য তন্দুর বা গভীর চুল্লীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। তন্দুরে পরোক্ষভাবে তাপ লাগিয়ে রুটি তৈরি করা হয়। পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক, খই, মুড়ি, চিড়া প্রভৃতি সেঁকা পদ্ধতিতেই তৈরি হয়ে থাকে। সেঁকা পদ্ধতিতে রান্না করলে খাদ্যদ্রব্যের গুণ নষ্ট হয় না।

(৬) **ভাজা** (Frying)—ভাজা প্রক্রিয়াটিতে কোন একটি স্নেহপদার্থ যথা—

তেল, ঘি বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থের সাহায্য নিতে হয়। স্নেজাতীয় পদার্থটি কড়াইয়ে খুব বেশি করে উত্তপ্ত করে, অর্থাৎ ১৮০° থেকে ২০০° ডিগ্রি সেলসিয়াসে আনার পর খাদ্যদ্রব্যটি তাতে ঢেলে দেওয়া হয়। স্নেহপদার্থে সিদ্ধ হয়ে গেলে ঐ খাদ্যদ্রব্যটি ভাজা হয়ে গেল। ভাজার সময়ে খাদ্যদ্রব্যের জলীয় অংশ বুদ্‌বুদের আকারে ভাজা দ্রব্যটি থেকে বের হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য মুখরোচক করবার জন্যই খাদ্যদ্রব্য ভাজা হয়। যেমন বেগুন, আলু, কুমড়া, মাছ ইত্যাদি ভেজে রঁাধলে ঐগুলো খেতে ভাল লাগে। ভাজা দ্রব্য খেতে ভাল হলে কি হয়, ভাজার ফলে ঐ খাদ্যের দ্রব্যগুন নষ্ট হয়। ভাজা খাদ্য দুষ্পাচ্যও বটে।

খাদ্য শস্যকণা, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম রঁাধবার উপায়

রান্না করবার পদ্ধতি জানলেই চলবে না, কোনটি কিভাবে রঁাধলে রান্না সুস্বাদু হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের অপচয়ও ঘটে না, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

খাদ্য শস্যকণা—আমরা সাধারণতঃ চাল, ডাল, গম খাদ্যশস্য রূপে গ্রহণ করি। চাল ও গম শ্বেতসার প্রধান খাদ্যদ্রব্য। ভাত রান্না করবার সময় যদি ফেন বা মাড় ফেলে দেওয়া হয় তাহলে ভাতের প্রচুর শ্বেতসার, ভাইটামিন ও ধাতব লবণ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব ভাতের ফেন না ফেলে দিয়ে ভাত কিভাবে রান্না করা যায় তা একবার দেখ। ভাতে মাড় রেখে ভাত ঝুরঝুরে করতে হলে এমনভাবে জল মেপে চালে দিতে হবে যাতে ভাতে সবটুকু জল মরে যায়। ভাত রান্না করবার জন্য সাধারণতঃ যতটা জল হাঁড়িতে চড়ান হয়, আন্দাজ করে তার ¾ অংশ জল দিয়ে চাল চাপিয়ে দিতে হবে। ২০।২৫ মিনিট পর দেখতে হবে ভাত অর্ধ সিদ্ধ হয়েছে কিনা। ভাত অর্ধ সিদ্ধ হলে ঢাকনা সমেত পাত্রটি উনান থেকে নীচে নামিয়ে মোটা চট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। আধঘণ্টা, ৪৫ মিনিট পর দেখা যাবে ভাত সিদ্ধ হয়েছে ও ঝুরঝুরে হয়েছে। এতে আঁচ কম লাগে, এবং খাদ্যপ্রাণও নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না।

গমের রুটি করতে হলে সেঁকে গমের রুটি তৈরি করতে হয়।

ডাল ভাল করে সিদ্ধ করে খাওয়া উচিত। জলের সঙ্গে ডাল ভাল করে সিদ্ধ করলে ডালের প্রোটিন সহজপাচ্য হয় এবং খাদ্যমূল্যের সামান্যই অপচয় ঘটে থাকে। ডাল সুসিদ্ধ হবার জন্য সোডা দেওয়া কখনই উচিত নয়।

শাক-সবজি—শাক-সবজির খোসা ফেলে দিয়ে, ঢাকা না দিয়ে রান্না করে আমরা তরি-তরকারির খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করে ফেলি। শাক-সবজি রন্ধন করতে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়, তাহলে শাক-সবজির খাদ্য মূল্যের বিশেষ অপচয় ঘটবে না। প্রথম অবস্থাতেই শাক-সবজি ভাল করে ধুতে হবে। কাটবার পরে আর ঐগুলো ধোওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয়তঃ, যথাসম্ভব তরকারির খোলা রেখে কাটতে হবে এবং তরকারির খণ্ডগুলি হবে বড় বড়। তৃতীয়তঃ, খুব কম জল দিয়ে রান্না করা বিধেয় এবং জল ফুটলে তবে তরকারিগুলো ছাড়তে হবে। চতুর্থতঃ, পাত্রের মুখ ঢেকে রান্না করতে হবে এবং খুব বেশিক্ষণ ধরেও সবজি সিদ্ধ হবে না এবং বার বার হাতা দিয়ে নাড়াচাড়াও করা অনুচিত।

মাছ—মাছের তন্তুসমূহ অত্যন্ত নরম ও অত্যন্ত অল্প সময়ে মাছ রান্না হয়ে যায়। সাধারণতঃ আমরা মাছ ভেজে রান্না করি। মাছের বহিরাবরণ থেকে জল বাষ্পীভূত করে দেওয়াই হচ্ছে মাছ ভাজবার মূল উদ্দেশ্য। তা করতে গেলে মাছের টুকরোগুলো যেন স্নেহপদার্থে ডুবে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাংস—মাংস রান্নার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংসের প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান নষ্ট না করে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য করা। অতএব মাংস রান্না করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাংস যেন সুসিদ্ধ হয়। অধিক উত্তাপ দিলেই যে মাংস সুসিদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই, বরং অধিক উত্তাপে মাংস সংকুচিত ও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। মোটামুটি ৮০° সেলসিয়াসে ধীরে ধীরে মাংস রান্না করলে মাংসের তন্তু নরম হবে। মাংসে পরিমাণ মত জল দিতে হবে, অত্যধিক জল দেওয়া অনুচিত। মাংসের টুকরোগুলি বড় হলে ভাল, তাতে অপচয় কম হবে। মাংস রান্না করবার সময় বেশির ভাগ সময় ঢাকনা উপরে রেখে রান্না করতে হবে।

ডিম—নানা ধরনের ডিম রান্না হয়। এক চতুর্থাংশ সিদ্ধ, আধা সিদ্ধ, পুরো ইত্যাদি। ডিম বেশি সিদ্ধ হলে দুষ্পাচ্য হয়। ডিমের সাদা অংশটি জেলীর মত অবস্থায় থাকলে এটি শরীরের উপকার সাধন করবে। ডিমের পোচ ও ডিমের ওমলেটও হয়। ডিমের পোচ শরীরের পক্ষে খুব উপকারী, কিন্তু ওমলেট ততটা নয়।

সূচী শিল্প

শিল্প-কাজের মধ্যে সূচীশিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর শিক্ষাগত সম্ভাবনা খুব বেশি। একথা পাওয়া যায় বিলেতের Handbook of Suggestion 1937-এ। শুধু বিলিতি বুলি আমরা আওড়াব না, আমরা নিজেদের জীবনেই দেখতে চাইব এর সম্ভাবনা কত বেশি। প্রত্যেকটি ছাত্রীকে আমরা দরজী বা ঐ জাতীয় কর্মী হতে বলছি না, কিন্তু এ শিল্পটি প্রত্যেক ছাত্রী যদি জানে, তবে কন্যা ও বোন বা দিদি হিসেবে এবং পরবর্তী জীবনে স্ত্রী ও মাতা হিসেবে সংসারে যে কতখানি সাশ্রয় করতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না।

তাছাড়া সূচীশিল্প ছাত্রীর সৃজনাত্মক প্রবৃত্তির বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়। ছাত্রী স্বীয় কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে নানা ধরনের প্যাটার্ণ তৈরী করতে পারে এবং এই শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর অপর একটি দিক। নিজের পরিবারের খুঁটিনাটি সেলাই ত আছেই, কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক দিকও ছাত্রীরা উন্নত করতে পারবে, যদি প্রয়োজন হয়। এমন বহু মহিলা আছেন যাঁরা গৃহে সূচীশিল্পের কাজ করে বাইরে সরবরাহ করে বেশ ভাল অর্থ উপার্জন করেন। অবশ্য এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ততটা সংহতি আসেনি, কিন্তু হয়ত অচিরেই আসবে। আজকাল বাইরের পাইকাররা মধ্যবর্তী হিসাবে অনেকটা লাভ করে নিয়ে যায়। অচিরেই হয়ত সেদিন আসবে, যখন সূচীশিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি আসবে এবং কর্মীরা মধ্যবর্তীকে ডিঙিয়ে সরাসরি সমবায়িকার বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

অতএব সূচীশিল্পের ভবিষ্যৎ একেবারেই নগণ্য নয়। সুতরাং সূচীশিল্প শিক্ষাগ্রহণে সকল ছাত্রীই অগ্রণী হয়ে আসবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা এই অধ্যায়ে সূচীশিল্পের মধ্যে কয়েকটি বিষয় অন্তর্গত করে নিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে (১) সেলাই কাজ, (২) বুনন কাজ ও (৩) এমব্রয়ডারি কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতির স্তর।

এ কয়টির কাজ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রীরা শিখে গেলে ওরা এমন একটি ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে, যেখান থেকে ঐ বিষয়ক অনেক জটিল কাজ তারা করতে সক্ষম হবে। যেমন অঙ্কের চারটি নিয়ম সমগ্র অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তি,

সেরূপ এই কয়টি প্রক্রিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার সোপান স্থায়ী পথ-নির্দেশক বলে গণ্য করা যেতে পারবে।

(১) সেলাই-এর কাজ

সেলাই-এর কাজের জন্য কিছু সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার প্রয়োজন। নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি জিনিস প্রাথমিক কাজ করবার জন্য সংগ্রহ করে নিলেই চলবে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস বৃদ্ধি করতে হবে।

বিভিন্ন জিনিসের তালিকা

১। বিভিন্ন সাইজের সূঁচ—মুখ বড় সূঁচও দরকার।

২। একখানা ভাল কাঁচি।

৩। গুলি-সূতো বা কাটিমের সূতো ও কাপড়।

৪। একটি মাপের ফিতে।

৫। রিপুকর্মের জন্য কাঠের গোল ফ্রেম।

ছাত্রীর প্রথম কাজ হচ্ছে সূঁচে সূতো পরান। প্রথমে বাম হাতে সূঁচটি ধরতে হবে এবং পরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে সূতো ধরে এবং সম্মুখ দিকে একটু বাড়তি সূতো রেখে এবং ওটাকে সম্পূর্ণভাবে সরল ও সোজা করে সূঁচের ছিদ্রের মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করতে হবে। সূতোর অগ্রভাগ বের হয়ে হলে ঐ সূতোকে ১০।১৫ সেমি. বের করে কেটে অপর প্রান্তটি ৩০।৪০ সেমি. লম্বা বা তারও কিছু বেশি লম্বা রাখতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে সূতোর বড় দিকটা যেন খুব বেশি বড় না হয়। প্রান্তভাগে একটি গিঁট দিতে হবে। ডবল সূতো যদি সেলাই করবার প্রয়োজন হয়, তাহলে উভয় প্রান্তটিকে সমান লম্বা করে শেষ প্রান্তে দুটো সূতোয় গিঁট দিতে হবে।

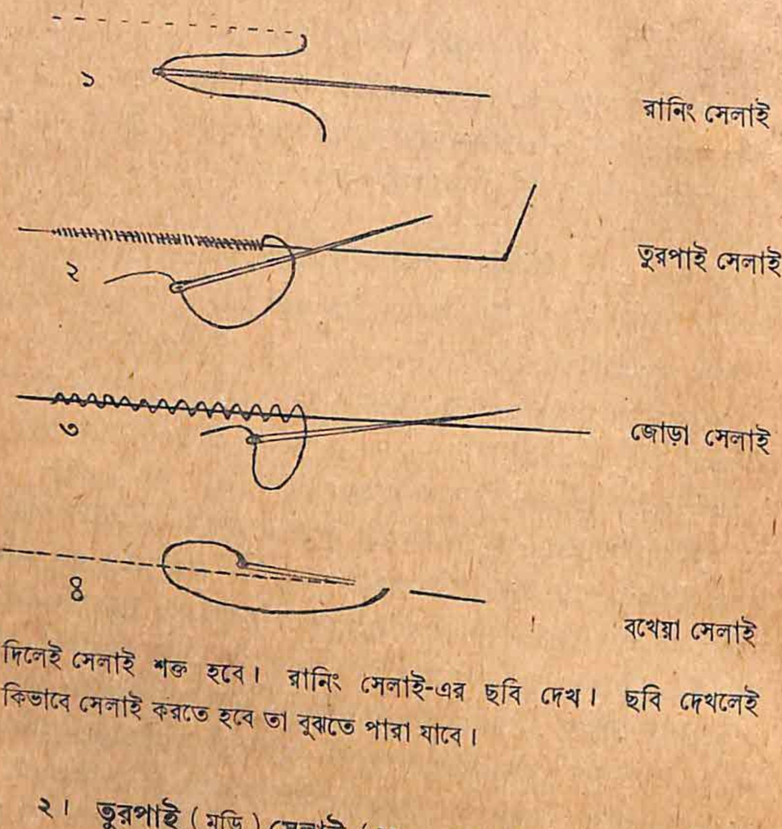
বিভিন্ন ধরনের সেলাই

সেলাই বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রথমেই নূতন কাপড়ে সেলাই না করে প্রথম শিক্ষার্থীকে পুরাতন কাপড়ের উপর সেলাই করে হাত সেট করে নিতে হবে।

(১) **রানিং সেলাই** (Running stitch)

সব চাইতে সহজ হচ্ছে রানিং সেলাই। প্রথমে ছোট কাপড় নিতে হবে। ছোটো কাপড়টিকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরে

নীচে অপর চারটি আঙ্গুল রেখে ৩।৪টি ফোঁড় দিতে হবে এবং তারপর স্থতো টেনে নিতে হবে। এভাবে প্রত্যেক বারে ৩।৪টি বা ৪।৫টি ফোঁড় দিয়ে স্থতো টেনে



দিলেই সেলাই শক্ত হবে। রানিং সেলাই-এর ছবি দেখ। ছবি দেখলেই কিভাবে সেলাই করতে হবে তা বুঝতে পারা যাবে।

২। তুরপাই (মুড়ি) সেলাই (Hem stitch)

মুড়ি সেলাইয়ের আর এক নাম হচ্ছে তুরপাই সেলাই। কেউ কেউ দুই-এর ভিতরে কিছুটা তারতম্য করে থাকেন। কাপড়ের মুড়ি ভেঙ্গে এ জাতীয় সেলাই করতে হয়। এই জাতীয় সেলাই করবার সময়, কাপড়ের প্রান্তভাগ ভাঁজ করে দিতে হয়। যাতে করে কাপড়ের স্থতোগুলো বের হয়ে না থাকে। মুড়ি সেলাই করবার সময় প্রথম শিক্ষার্থীরা একটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে। প্রথমে তারা কাপড়ের প্রান্তভাগটি ছোট বড় যতটা করতে হবে তা মেপে লম্বালম্বি ভাঁজ করে রানিং সেলাই করে মাপ করে নিতে পারা যায়। একে টেঁকে নেওয়া বলে। রানিং সেলাইটা একটু ভিতরের দিকে হবে। পরে ছোট কিনারাটা

মুড়ি সেলাই করে যাওয়া হয়। বালিশের ওয়াড়, জানালার পর্দা এভাবে সেলাই করা যায়।

৩। জোড়া সেলাই (Scaming)

দুই টুকরো কাপড়কে যখন মুড়ি না ভেঙে জুড়ে দিতে হয়, তখন প্রয়োজন হয় জোড়া সেলাইয়ের। দুটি ফিতে একত্র করে জুড়বার সময় কিংবা দুটি পাড় জুড়বার সময় এই জাতীয় সেলাই করার দরকার পড়ে। জোড়া সেলাই যখন করতে হয় তখন সূঁচটি ধরতে হয় ডান হাতে এবং পরে ফিতা বা পাড়ের নিচের দিক দিয়ে উপরের দিকে ফোঁড় তুলতে হবে। ফোঁড় যখন তোলা হয়ে গেল তখন অন্য ফিতার বা পাড়ের নিচ থেকে উপরের দিকে ফোঁড় তুলতে হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে একবার ডানদিকে একবার বামদিকে ফিতায় বা পাড়ে ফোঁড় দিয়ে যদি সেলাই করা যায় তবে সেটা হবে জোড়া সেলাই। সেলাই শেষ হয়ে গেলে শেষ প্রান্তে একটি গিঁট দিতে হবে। জোড়া সেলাইয়ের সময় জোড়া ফিতা বা পাড়ের সেলাই কি জাতীয় হবে, তা জোড়া সেলাইয়ের ছবি থেকেই বুঝতে পারা যাবে। বলা বাহুল্য, দুই দিকের ফোঁড় সমান হবে, তাহলেই সেলাই দেখতে সুন্দর হবে।

৪। বখেয়া সেলাই (Stiching)

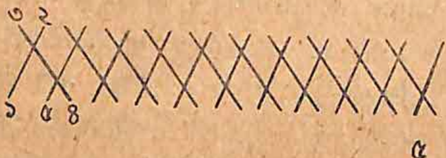
সুইং মেসিনে সেলাই হলে আমরা কি দেখতে পাই? দেখি উপরে ও নিচে একই রকম সেলাই হয়ে গেছে। বখেয়া সেলাই হলেও তেমনি দেখতে হবে। আগের পৃষ্ঠার ছবি দেখলেই এ কথার সত্যতা বুঝতে পারা যাবে। এই জাতীয় সেলাই করতে হলে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মটি হল প্রথমে রান সেলাইয়ের মত করে সূঁচ সামনের দিকে চালাতে হবে এবং সূঁচ নিচের দিক থেকে উপরের দিকে তুলে আনতে হবে এবং পরে সূতো ভাল করে টেনে পুনরায় সূঁচের অগ্রভাগ প্রথম ফোঁড়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় উপর থেকে নিচের দিকে ফোঁড় দিতে হয়। পরে পূর্বের মত নিচ থেকে উপরের দিকে একটু সামনে এগিয়ে ফোঁড় তুলতে হবে। অনুরূপ ভাবে পুনরায় দ্বিতীয় ফোঁড়ের কাছে ফিরে এসে দ্বিতীয় ফোঁড়ের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূঁচ চালিয়ে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে নিচে থেকে উপরের দিকে ফোঁড় তুলতে হবে। এভাবে ধীরে

ধীরে পর পর ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে গেলে মেসিনের সেলাই-এর মত উপরে নিচে সমান সেলাই পড়ে যায়।

৫। ক্রশ সেলাই (Cross stitch)

এস্থানে আলোচনা করা হচ্ছে ক্রশ সেলাই-এর কথা। এই সেলাই ইংরেজি cross-এর মত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ক্রশ সেলাই। এটা গুণ চিহ্নের মত দেখতেও বটে। সাধারণতঃ ফ্লানেল, সার্জ, আলোয়ান প্রভৃতি গরম কাপড় সেলাই করতে হলে এই জাতীয় সেলাই-এর সাহায্য নিতে হয়।

ক্রশ সেলাই করতে হলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সূতোর প্রান্তে প্রথমে একটি গিঁট দিয়ে বাম দিক থেকে সেলাই শুরু করতে হয়।



ক্রশ সেলাই

প্রথম ফোঁড়টি নিচে থেকে উপরের দিকে ফোঁড় তুলতে হবে। ছবিতে ১নং স্থান থেকে ফোঁড় তুলে সূতো উপরের দিক দিয়ে চালিয়ে নিয়ে ২নং স্থানে উপর থেকে নিচের দিকে ফোঁড় দাও। পরে সূতো টেনে নিয়ে এসে ৩নং স্থানে নিচ থেকে উপরের দিকে ফোঁড় তুলে আর সূতো উপর দিয়ে টেনে নিয়ে এসে ৪নং জায়গায় উপর থেকে নিচের দিকে ফোঁড় দাও। তারপর নিচ দিয়ে সূতো এনে ৫নং জায়গায় নিচে থেকে উপরের দিকে ফোঁড় দিয়ে উঠিয়ে আগের মত করে উপর দিয়ে ক্রশ করে অন্য দিকে যাও। এভাবে ক্রমাগত চললেই ক্রশ সেলাই হয়ে গেল। পাশের ছবি দেখলেই ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবে।

৬। রান ও ফেল সেলাই

কাপড় যদি ছিঁড়ে যায় এবং সে জায়গায় যদি তালি দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে রান ও ফেল সেলাই দিতে হয়। যে জায়গাটা তালি দিতে হবে, তার চেয়ে একটু বড় করে তালি দেবার কাপড় কাট এবং তারপর সেই তালিটার ধার মুড়ে ছেঁড়া জায়গার উপর ঢাকা দাও এবং রান সেলাই কর।

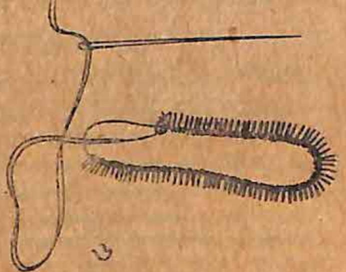
৭। রিপু করা

ভাল কাপড় বা শাড়ী অল্প ছিঁড়ে গেলে, তা রিপু করে নিলে ভাল হয়। দামী শাড়ী কাপড় বরবাদ হয়ে যাবার চাইতে একটু কষ্ট করে রিপু করে নাও। রিপু করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। লম্বা ছেঁড়া জায়গায়টা গোল ফ্রেমে বসিয়ে নেওয়া যায়, কিংবা ছেঁড়া ছোট হলে বসে হাতে ধরেও রিপু সেলাই করা যায়। ছেঁড়া জায়গার উপরে নিচে ৩·৫ সেমি. জায়গা জুড়ে খুব ঘন করে রান সেলাই দিতে হয়। নিচে থেকে উপরের দিকে গিয়ে আবার উপরের দিক থেকে নিচের দিকে রান ফোঁড় দিয়ে নামাতে হবে। রিপু সেলাই করলে কাপড় শাড়ী অন্য দিকে হয়ত ভবিষ্যতে ছিঁড়বে, কিন্তু ঐ জায়গা আর ছিঁড়বে না। রিপু করার সময় একটি দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাপড়ের সুতোর মত সুতো দিয়ে রিপু করতে হয়। অত সরু সুতো না পাওয়া গেলে, কাপড় বা শাড়ীর আঁচল থেকে সুতো খুলে রিপু কর।

৮। কাজ-ঘর সেলাই (Buttonhole-stiching)

ব্লাউজ, সার্ট বা পাঞ্জাবীতে বোতামের ঘর থাকে। বোতাম ঘরের সেলাইকে বলা হয় কাজ-ঘর সেলাই।

কাজ-ঘর সেলাইয়ের পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমটায় বোতাম যাতে প্রবেশ করতে পারে সেই মাপ অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে কাজ-ঘরগুলি কেটে নিতে হবে। কাজ-ঘরের সেলাই একটু ভিন্ন ধরনের। মাঝারি সাইজের সূঁচে সুতো পরিয়ে দুটে মুখ একত্র করে গিঁট দাও। তারপর যে কোন জায়গা থেকে সেলাই আরম্ভ কর। প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক সেলাইয়ের মুখে একটি করে এমন গিঁট দাও যাতে গিঁটগুলি লাইন-বন্দীভাবে সুন্দরভাবে দেখা যায়। পাশের ছবি দেখলেই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে। সেলাই করবার সময় প্রথমে নিচের দিক থেকে উপরে একটি ফোঁড় তুলতে হবে। সূঁচ অর্ধেক উঠিয়েই সূঁচের সুতো টান দিয়ে সূঁচের মধ্য দিয়ে সুতো এমনি ভাবে ঘুরিয়ে দাও যে সুতো টানলেই ঘরের মুখে একটি গিঁট পড়ে যায়।


৬
কাজঘর সেলাই

৯। মেসিনে সেলাই

হাতে যেমন নানা ধরনের সেলাই আছে, মেসিনে কিন্তু নানা ধরনের সেলাই সাধারণভাবে নেই। একই ধরনের সেলাই চলে মেসিনে—উপরে নিচে একই রকম সেলাই পড়ে যায়। হাতে যেমন সূক্ষ্ম সেলাইয়ের ব্যবস্থা আছে, তেমন সূক্ষ্ম সেলাই মেসিনে হয় না। তবে মেসিনের সেলাই-এর ফোঁড়ের মাপ কমান বাড়ান চলতে পারে।

মেসিনে সেলাই করায় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নাই। যন্ত্রের কাজ—হাত দিয়ে হাণ্ডেল চালালেই এবং সূঁচের নিচে কাপড় দিলেই সেলাই হয়ে যাবে। পা-মেসিন চালাতে সামান্য অভ্যাসের প্রয়োজন।

মেসিনে সার্ট, প্যান্ট, কোট, ইজের, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি সহজে তৈরি করা চলে। এসব জিনিস তৈরি করতে হলে কাটিং শেখা দরকার।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিদ্যালয়ের সীবন শিল্পীর কাছে বিভিন্ন পোশাকের মাপ ও কি করে কাপড় কেটে তা সেলাই করতে হয়, তা শিখে নাও।]

পশম বোনা

পশম বা উল দিয়ে সোয়েটার, জাম্পার, টুপি, মোজা, পেনি ইত্যাদি বোনা যায়। এ কাজ মেয়েদের কাছে খুবই প্রিয় কাজ। মেয়েরা এ কাজ করতে করতে



১

উল বোনার বিভিন্ন ধরনের কাজ

এমনই দক্ষতা অর্জন করে যে তারা তখন আর বোনার কাঁটা দেখে চালান না, না দেখেই তারা কাঁটা চালাতে পারেন। উলের কাজ করে অনেকে ভাল

রোজগার করে থাকেন। অনেক দুঃস্থা এই কাজ করেই সংসারও চালিয়ে থাকেন।

উলের কাজ শিখবার জন্য প্রাথমিক নির্দেশিকাগুলিতে আমরা আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখব।

পশমের কাজে প্রথম আবশ্যকীয় জিনিস অবশ্য পশম। পশম অবশ্য প্রথমেই সংগ্রহ করতে হবে। তারপরের প্রয়োজন হচ্ছে যা দিয়ে পশম বোনা হবে সেই জিনিস অর্থাৎ বোনার কাঁটা। কাঁটা শুধু একই সাইজের হয় না। বোনার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটাগুলি খুব মোটা থেকে খুব সরু পর্যন্ত হয়। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি দেখলেই কাঁটাগুলির সাইজ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে, তারপর কাঁটা দিয়ে যখন কাজ করবে তখনও ভালভাবেই বুঝতে পারবে।

ঘর তুলবার পদ্ধতি

উল দিয়ে কাজ করতে শুরু করবার পূর্বে উলের লাছি থেকে উলগুলো ধীরে ধীরে বের করে গোল করে নাও। তারপর উলের বলের প্রান্ত থেকে ১২।১৪ আঙ্গুল উল ছেড়ে দিয়ে একটি ফাঁস তৈরি কর। ফাঁস তৈরি হবে এমনিভাবে যেন ছেড়ে দেওয়া উল উল্টা হয়ে ঝুলে থাকে। এর পরে ফাঁসের ভিতরে ডান হাতের কাঁটাটি ঢুকিয়ে দাও এবং একটু টেনে নিয়ে এঁটে দাও। দেখবে ঘর উঠে যাবে। এই পদ্ধতিতে ১২।১৪টি ঘর তুলে ডান হাতের কাঁটাটি বাম হাতে নিয়ে যাও এবং আর একটি কাঁটা ডান হাতে নাও। এখন ডান হাতের কাঁটার মাথাটা বাম হাতের কাঁটার শেষ কাঁটাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে সেটি বাম হাতের কাঁটার নিচে চলে যাবে। তারপর প্রথম ফাঁস তৈরি করবার সময় যে ১২।১৪ আঙ্গুল পরিমাণ উল ঝুলেছিল সেটা বাম হাতের কাঁটার সঙ্গে চেপে ধরে রাখ। পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে কি বলতে চাইছি।



২

ঘর তুলবার পদ্ধতি

উলের দুটি কাঁটা একসঙ্গে হয়ে যাবার ফলে উলের বল থেকে উল ঝুলে

থাকতে দেখবে। এরপরে কাঁটা দুটি একসঙ্গে জুড়ে ধরে ডান হাতের আঙুলের ঝুলে থাকা উল ডান হাতের কাঁটার মাথায় জড়াও এবং নিচের দিকে ঘুরিয়ে আবার উপরের দিকে ঝুলিয়ে দাও।

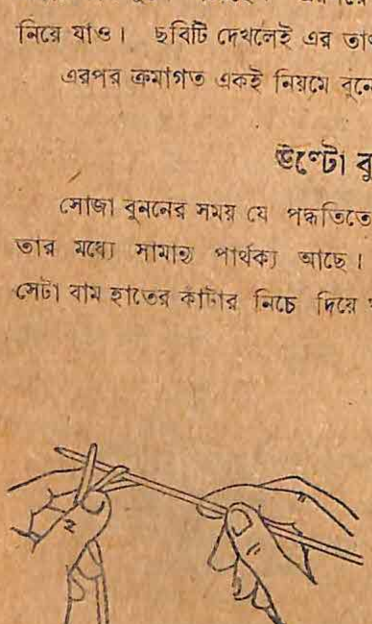
সোজা বুনন পদ্ধতি

এখন উলের গোড়া ডান হাতের কাঁটার মাথায় আছে দেখতে পাবে। এখন ঐটিকে বাম হাতের কাঁটার মাথায় যে ফাঁসটি আছে তার ভিতরে টেনে আন ঐ নূতন ফাঁসটি বাম হাতের কাঁটার মাথা মালা গলিয়ে ঝুলিয়ে দাও। দেখতে পাবে একটি ফাঁস ঝুলে পড়েছে। এরপরে এই ফাঁসটি ডান হাতের কাঁটার মাথায় নিয়ে যাও। ছবিটি দেখলেই এর তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

এরপর ক্রমাগত একই নিয়মে বুনে যাও। এটা হচ্ছে সোজা বুনন।

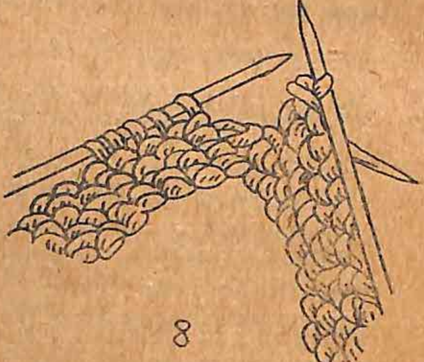
উল্টো বুনন পদ্ধতি

সোজা বুননের সময় যে পদ্ধতিতে সেই পদ্ধতিতেই উল্টো বুনন হবে, তবে তার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। সোজা বুননের সময় যে কাঁটাটি আছে সেটা বাম হাতের কাঁটার নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে উল কাঁটার নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে



৩

সোজা বুনন



৪

উল্টো বুনন

এস। ডান হাতের কাঁটা বাম হাতের কাঁটার শেষ ঘরে ঢুকিয়ে দাও এবং দেখ ডান হাতের কাঁটাটা বাম হাতের কাঁটার উপর এসেছে। এই সময়ে উলকে ডান হাতের কাঁটার ঘরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গলিয়ে আন। এইভাবেই উল্টো বুনন চলবে। (ছবি দেখ)

ঘর কমানো ও বাড়ানো

যেখানে দুটি ঘর ছিল সেখানে একটি ঘর কর। কিভাবে করবে? বাম হাতের কাঁটার মাথায় ডান হাতের কাঁটার শেষ ঘর দুটির ভিতর দিয়ে ভর, তাহলে দেখতে পাবে দুটি ঘরের জায়গায় একটি ঘর হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঘর কমানো।

এবার ঘর বাড়ানোর কথা। কিভাবে করবে? বাম হাতের কাঁটার মাথায় একটি ঘরের মধ্যে ডান হাতের কাঁটার মাথাটি ঢুকিয়ে দাও ও একটি ঘর তৈরি কর। তাহলে দেখতে পাবে একটি ঘর বেশি হল। এই পদ্ধতিতে ঘর। বাড়ানো চলে।

ঘর বন্ধ করার পদ্ধতি

সব ঘরগুলি দুটো কাঁটার মধ্যে সমানভাবে ভাগ কর—এবং কাঁটা দুটি পাশাপাশি রাখ। তারপর বোনা কাজটি উল্টোভাবে রাখ এবং একটি কাঁটা দিয়ে



ঘর বন্ধ করার পদ্ধতি

প্রথম দুটি ঘরের ভিতর দিয়ে বুনে ডান হাতের কাঁটায় আন, পরে ডান হাতের কাঁটায় পেছনের ঘরটা সামনের ঘরের উপর দিয়ে ফেলে দাও। এইভাবে ঘর বন্ধ কর। (ছবি দেখ)

বিভিন্ন ধরনের উলের জামা তৈরি

তোমরা এখন কাঁটা ধরে ঘর তুলতে শিখেছ। এ অবস্থা থেকেই তোমরা বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন তুলতে পারবে এবং প্যাটার্ন দেখে জামা বুনতেও পারবে। নানারকমের প্যাটার্ন আছে যথা রিব প্যাটার্ন, মস প্যাটার্ন, বাস্কেট প্যাটার্ন

ব্লক প্যাটার্ণ এবং আরও নানা ধরনের কঠিন প্যাটার্ণ ইত্যাদি। একবার হাত চালু হয়ে গেলে তোমরা প্যাটার্ণ দেখে সব রকমের কাজ করতে পারবে।

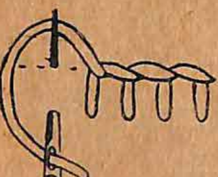
এমব্রয়ডারি

এমব্রয়ডারি কথাটি ইংরেজী শব্দ হলেও এই বিশিষ্ট ধরনের সূচীশিল্পের কাজটি ঐ ইংরেজী নামেই বাংলাতে চলে এসেছে। সূচীশিল্পেরই একটি বিশেষ ধরন হচ্ছে এমব্রয়ডারি। কাপড়ে নানারকম ফুল তুলে টেবিল ক্লথ, জানালার পর্দা, রুমাল ইত্যাদি করা যায়। দেখতে খুব সুন্দর হয় বলে, এর চাহিদা মানুষের কাছে খুব বেশি।

এমব্রয়ডারি করতে হলে বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়ের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বহু রকমের ফোঁড় থাকে। আমরা এখানে সাধারণ এমব্রয়ডারি কাজের উপযুক্ত কয়েকটি ফোঁড়ের কথাই উল্লেখ করছি।

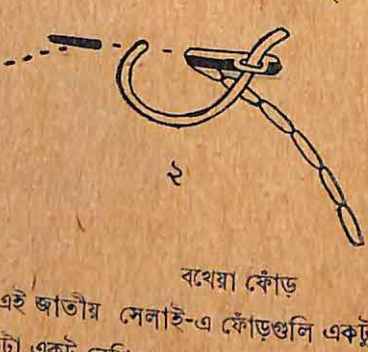
১। কম্বল ফোঁড়

কম্বলের একটি দিক মুড়ে সেলাই করতে যে ফোঁড়ের প্রয়োজন করা হয় তাকে কম্বল ফোঁড় বলা হয়। কম্বল ফোঁড়ের ছবি নীচে দেওয়া হল। দেখেই বুঝতে



১

কম্বল ফোঁড়



২

বখেয়া ফোঁড়

পারছ এ জাতীয় সেলাই খুব সোজা। এই জাতীয় সেলাই-এ ফোঁড়গুলি একটু ফাঁকে ফাঁকে করতে হবে এবং চওড়ার দিকটা একটু বেশি লম্বা রাখা প্রয়োজন।

২। বখেয়া ফোঁড়

বখেয়া ফোঁড়ের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বখেয়া ফোঁড়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উহা মেসিনের সেলাইয়ের মত উপরে নিচে একই রকম সেলাই

হয়। বখেয়া সেলাইতে আমরা জেনেছি প্রথমে কাপড়ে ফোঁড় তুলে সূঁচকে একটু পিছন দিকে নিয়ে এসে আর একটি ফোঁড় দিতে হবে এবং এই ফোঁড়টি আগের ফোঁড়ের মাথা থেকে একটু এগিয়ে যাবে। ছবি দেখলেই বিষয়টি ভাল বোঝা যাবে।

৩। ক্রশ ফোঁড়

ক্রশ ফোঁড়ের সাহায্যে নেটের উপর পশুপাখি, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি তোলা যায়। প্রথমে নেটের বা কার্পেটের একটি ঘরের নিচের দিক থেকে সূঁচটি উপরের দিকে তুলে আন। তারপর এক ঘর টপকে গিয়ে তৃতীয় ঘরে সূঁচ ঢুকিয়ে দাও। তারপর নিচের ঘরেও এক ঘর বাদ দিয়ে পরের ঘরটিতে সূঁচটিকে উপরে তুলে আন। ঐ ঘর থেকে আবার খোলাখুলিভাবে একটি ঘর বাদ দিয়ে পরের ঘরে ফোঁড় দাও। সূচীশিল্প কাজের প্রথম দিকে তোমরা ক্রশ ফোঁড় শিখেছ, সেই নীতি অনুযায়ীই তোমাদের কাজ করতে হবে। (ছবি দেখ)।

৪। চেন ফোঁড়

চেন ফোঁড় অনেকটা শিকলের মত দেখতে বলেই একে বলা হয় চেন ফোঁড়। এই ফোঁড় তুলতে হলে প্রথমে কাপড়ের নিচ থেকে ২।৩টি সূতো নিয়ে একটি ফোঁড় তোল। পরে সেই ফোঁড়ের পাশ দিয়েই সূঁচটাকে নিচের দিকে বসাও এবং


৩

ক্রশ ফোঁড়


৪

চেন ফোঁড়

বাম থেকে ডান দিকে ডান দিকে ঘুরিয়ে এনে উপরের দিকে তোল। এরূপ ফোঁড় তুলবার সময় দেখতে পাবে ঘুরানো সূতোর মাথার দিকে সূঁচের সঙ্গে উঠে এসেছে সূতোটি। এরপর উঠানো সূতোর গোড়ায় সূঁচটি ঢুকিয়ে এবং আগের মত আর একটি ফোঁড় তোল। এইভাবে পর পর ফোঁড় তুলে যাও, তাহলে চেন ফোঁড় হবে।

৫। ডেইজি ফোঁড়

চেন ফোঁড়ের মতই হচ্ছে ডেইজি ফোঁড়। তবে একটু আলাদা তাতে সন্দেহ নাই। এই ফোঁড়ে সুতোর ফাঁসের সামনে এবং দুপাশে দুটি সুতোর লাইন দেখতে পাবে। প্রকৃতপক্ষে আলাদাভাবে এক একটি চেন ফোঁড় রয়েছে। ছবি দেখলেই বিষয়টি বুঝতে পারবে।

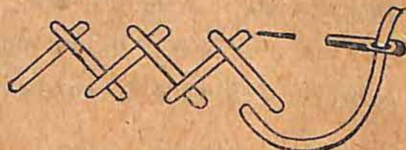
৬। হেরিং বোন ফোঁড়

এই জাতীয় ফোঁড় হেরিং মাছের কাঁটার মত দেখায়, তাই একে বলা হয় হেরিং বোন সেলাই। এটা দেখতে অনেকটা ক্রশ সেলাই-এর মতই, তবে



৫

ডেইজ ফোঁড়



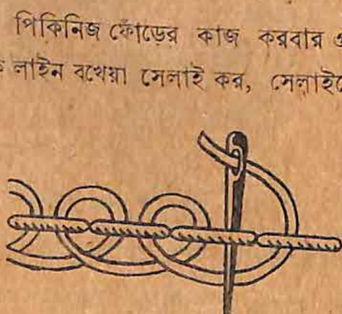
৬

হেরিং বোন ফোঁড়

সামান্য যে পার্থক্যটুকু আছে তা পাশের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। এ কাজ তোমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

৭। পিকিনিজ ফোঁড়

পিকিনিজ ফোঁড়ের কাজ করবার প্রাথমিক নির্দেশ হিসেবে বলা যায় প্রথমে এক লাইন বখেয়া সেলাই কর, সেলাইয়ের সময় প্রত্যেকটি ফোঁড়ের সমান মাপ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এর পরবর্তী অবস্থায় বাম দিক থেকে ডান দিকে সেলাই কর। সূঁচ নিচে থেকে উপরের দিকে তোল। তারপর উপর থেকে ১নং ফোঁড়টির নিচে দিয়ে সেলাই কর। এরপর ৩নং ফোঁড়ের নিচে দিয়ে পুনরায় সূঁচটিকে



৭

পিকিনিজ ফোঁড়

উপরে তুলে ২নং ফোঁড়ের নিচে দিয়ে আন। বখেয়া সেলাইকে কেন্দ্র করে এরূপ

সেলাই করলে সেলাইয়ের ফাঁসগুলি খুব শক্ত হবে বলে দেখা যাবে।

এই কয়টি ফোঁড় ছাড়াও এমব্রয়ডারি কাজে আরও কয়েক রকম ফোঁড় আছে সেগুলি হচ্ছে ডাল ফোঁড়, তুরপাই ফোঁড়, পালক ফোঁড়, বোতাম ঘর ফোঁড় ইত্যাদি। এগুলি তোমরা সহজেই শিখে নিতে পারবে।

বিভিন্ন রঙের সুতোর ব্যবহার

এমব্রয়ডারিতে বিভিন্ন রঙের সুতোর ব্যবহার করতে হয়। যেসব লতাপাতা ফুল ইত্যাদির ডিজাইন তুমি কাপড়ে তুলবে, সেই লতাপাতা ফুল ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তুমি রঙিন সুতো ব্যবহার করবে। নিজের ইচ্ছামত রঙের ব্যবহার করলে চলবে না। পাতার উপর সেলাই তুলতে গিয়ে তুমি হলুদ বা লাল রঙ



৮

রং ঠিক করা



৯

সুতোর রং ঠিক করা

কখনো দেবে না, দেবে সবুজ রঙ। এইভাবে জিনিসের প্রকৃতি অনুযায়ী রঙিন সুতোর ব্যবহার তোমরা করবে।

উপরে এমব্রয়ডারি করার উপযুক্ত দুটি ছবি দেওয়া হল। প্রথম ছবিটিতে ফুল,

লতাপাতা ইত্যাদি রয়েছে। প্রত্যেকটি আলাদা জিনিসে নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বর অনুযায়ী রঙ স্থির করে নাও এবং পরে ফোঁড় তোল।

দ্বিতীয় ছবিও প্রায় একই জাতীয়। এখানে নম্বর দেওয়া হয়নি। তোমরা উপযুক্ত রঙ স্থির কর এবং ফোঁড়ের কাজ করে ফেল।

সাধারণভাবে সেলাই, উলের কাজ ও এমব্রয়ডারির কাজের উপযুক্ত প্রাথমিক নির্দেশগুলি দেওয়া হল। তোমরা যদি এই প্রাথমিক নির্দেশগুলি মেনে চলে কিছুটা দক্ষতা লাভ করতে পার তাহলে তোমাদের সূচীশিল্প শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হল, তোমরা অনায়াসে আরও বেশি অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে।

প্রথম ভাগ
সমাজসেবা

বিদ্যালয়ে সমাজসেবার কেন্দ্র কেন হবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। তার পূর্বে বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ—এই বিষয়টি আমাদের আলোচনা করা দরকার। তবেই বিদ্যালয় কেন সমাজসেবার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠবে তা বুঝতে পারা যাবে।

বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয় সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এবং সমাজের ভাবধারা বিকিরণের কাজই বিদ্যালয় করছে। বিদ্যালয়কে একটি মামুলি জ্ঞানের বিকিরণকেন্দ্র বলে মনে করা উচিত নয়। বিদ্যালয় হচ্ছে এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্বে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সমাজকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখা হত। সমাজ অনাচারে পরিপূর্ণ, এবং সেই সমাজের সংস্পর্শে যদি শিক্ষার্থীরা আসে তাহলে শিক্ষার্থী উপযুক্ত শিক্ষা পেতে পারবে না। রুশো তাই শিশুকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ-সমস্যা বহির্ভূত উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী করে যদি শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা যায়, তাহলে শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। তথ্যের গুরুভারে শিক্ষার্থীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সুতরাং বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে একটি সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে একটি অপরের উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে শিক্ষাকে সমাজাশ্রয়ী করে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় হবে আদর্শ সমাজ এবং তা বৃহত্তর সমাজের দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা, অপূর্ণতা, অবিশুদ্ধতা, সামঞ্জস্যহীনতা, দ্বন্দ্ব, জটিলতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে। গৃহ ও সমাজজীবনে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেই বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই বিদ্যালয়ে তার সমাধান হবে এবং শিক্ষাও সেইভাবে দানা বেঁধে উঠবে।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেছেন যে বিদ্যালয় সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবি হবে। তাহলেই বিদ্যালয়গুলির সাথে ভারতীয় জীবনের নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যালয়ের এই রূপকে কিছুটা তত্ত্ব হিসেবে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হচ্ছে বস্তুতপক্ষে একটি সমাজকেন্দ্র। বুনিয়াদী বিদ্যালয় জাতীয় সংহতি স্থাপনের একটি ক্ষেত্রও বটে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যাবে এবং সমাজের সঙ্গে সহযোগিতায় নানা ধরনের কাজ করে যাবে। একটি আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। অনেক সময় বিদ্যালয় গ্রামের সাফাই কাজ, 'অধিক ফসল ফলাও', মহামারী ও সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধে এবং অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কিন্তু বর্তমানে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় শুধু রয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রায় কোথাও নেই। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী বিদ্যালয় যে মহান্ আদর্শ স্থাপন করে গেছে, তা আমরা অনুসরণ করতে বিরত থাকব কেন?

বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান এসব কাজের গুরুত্ব বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করে এরূপ সেবামূলক কেন্দ্র স্থাপনা করেছেন, সেখানে শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই কাজ করছে না, গ্রামের অন্যান্য লোকও অংশ গ্রহণ করছে। এরকম কাজের ইউনিট ধরা হয়েছে ৩।৪টি গ্রাম। তবে কাজ মোটামুটি ভালই হচ্ছে, কিন্তু আরও ভালভাবে কাজ হতে পারবে যদি প্রত্যেকটি উচ্চ বিদ্যালয়েই সেবামূলক কাজের জন্য এক একটি ইউনিটে পরিণত হয়।

কিভাবে বিদ্যালয় সেবামূলক কাজের ইউনিট হবে তার নির্দেশিকা রয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যসূচীতে। আমরা সেই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়গুলি আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হব।

১। রোগ-পরিচর্যার ক্ষেত্র

বিদ্যালয় সমাজকেন্দ্র। অতএব সমাজের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্তব্য আছে সে কথা আমরা পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন কি করে রোগ-পরিচর্যার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়কে ব্যবহার করা যাবে, তার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

পরিচর্যা-গৃহ—বিদ্যালয়গৃহের বাইরের দিকে একটি ঘর পরিচর্যা-গৃহ হিসাবে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। সেই পরিচর্যা-গৃহের নেতৃত্ব করবে কয়েকজন উঁচু শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রী। অবশ্য এদের একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা

তত্ত্বাবধান করবেন। নেতারা সকলেই প্রতিদিন ঐ পরিচর্যা-গৃহে উপস্থিত থাকবে। তারা রুটিন অনুযায়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করবে, এবং তাদের সহকারী থাকবে কয়েকজন ছাত্র বা ছাত্রী। তারাও প্রতিদিন থাকবে না। প্রত্যেককে একইরূপ অভিজ্ঞতা দেবার প্রয়োজন আছে বলেই এই ব্যবস্থা।

কারা এখানে আসবে—বিদ্যালয়ের এই পরিচর্যা-গৃহটি নির্দিষ্ট থাকবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কিংবা বাইরের হঠাৎ অসুস্থ-হওয়া কোন রোগীর জন্য, যাতে কিছুটা পরিচর্যার পরই তাকে গৃহে যেতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

পরিচর্যা-গৃহের জিনিসপত্র—ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কেউ হঠাৎ খুব জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। তাকে বিছানায় শুইয়ে ভাল করে মাথা ধুইয়ে দিতে হবে। তার জন্য চাই, মগ, বালতি, তোয়ালে ইত্যাদি। তা ছাড়া খাট বিছানা ত আছেই। আইস ব্যাগ কিংবা হট ওয়াটার ব্যাগও হয়ত দরকার হতে পারে। ওষুধের ব্যবস্থা হলে, সেটা যদি তরল ওষুধ হয়, তা পান করাবার জন্য মেজার গ্লাস থাকাও দরকার।

বেডপ্যান ও ইউরিন্যালও পরিচর্যা-গৃহের জন্য দরকার। রোগী যদি এমন হয় যে তাকে সেদিনই বিদ্যালয় থেকে অপসারণ করা না যায় তাহলে তাকে ত সেই রাত সেখানেই থাকতে হবে। পায়খানা করার জন্য বেডপ্যান ও প্রস্রাবের জন্য ইউরিন্যাল রাখতে হবে।

দেহের উত্তাপ গ্রহণের জন্য থার্মোমিটারও চাই। তাপ সাধারণতঃ মুখে নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থাকবে শুশ্রূষাকারী বা শুশ্রূষাকারিণী। তারা এসব বিষয়ে ইস্কুলের চিকিৎসকের কাছে শিক্ষালাভ করবে।

শুশ্রূষাকারীর গুণাবলী—শুশ্রূষাকারীর প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে ধৈর্য-ধারণ। অসুস্থ রোগীকে সেবা করা ক্লান্তিকর মনে হলে চলবে না। রোগীর সমস্ত নোংরা অপসারণের কাজ তাকে করতে হবে। সে হবে শান্ত ও প্রফুল্ল, কর্তব্যপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। তার অপর গুণ হল পর্যবেক্ষণ শক্তি ও চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য।

পরিচর্যা-গৃহের ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যালয়ের চিকিৎসকের প্রয়োজন একথা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে এসে পরিচর্যা-গৃহে বসবেন, এবং স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ও বহিরাগত রোগীদের দেখবেন।

এক্ষেত্রে সমাজের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় ত সমাজেরই। সমাজের কোন কোন চিকিৎসক যদি বিদ্যালয়ের পরিচর্যা-গৃহে এসে বসেন এবং

পয়সা না নিয়ে রোগী দেখেন তাহলে খুব ভাল হয়। এইভাবে Community resources tap করতে হয়।

পরিচর্যা-কেন্দ্রের আর একটি কাজ হবে গ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা। গ্রামে নানা রোগ দেখা যায়, তার জন্য সতর্কতা পূর্বেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রামে যাতে নোংরা না জমে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এবং সেজন্য বিদ্যালয়ের 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংস্থার' কাজ রয়েছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিঃসন্দেহে রোগ-প্রতিরোধের একটি উপায়। তাছাড়া গ্রামে যাতে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড রোগ দেখা না দেয়, তার জন্যও ছাত্রছাত্রীদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অল্প তালিম পেলেই বসন্তের টীকা বা কলেরা টাইফয়েডের ইনজেকশন দিতে পারবে। প্রথমে অবশ্য এর জন্য দক্ষ লোক দরকার। কিন্তু ছাত্রছাত্রীও স্বল্প কালেই এই কাজটি শিখে ফেলতে পারবে। গ্রামের যেসব লোক পরিচর্যা-কেন্দ্রে আসবে, তারা ত টীকা এবং ইনজেকশন নিয়ে যাবেই, তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কোন কোন দল আঞ্চলিক সাফাই কালে টীকা ও ইনজেকশন দিতে বের হবে। অবশ্য একাজ যে সারা বছর ব্যাপী চলবে, তা নয়, গ্রামে রোগের প্রাদুর্ভাব হলেই এসব কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রসর হয়ে আসতে হবে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা সংস্থা

প্রাথমিক প্রতিবিধান কাকে বলে—বিদ্যালয় গৃহে আর একটি কক্ষ নির্দিষ্ট থাকবে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক প্রতিবিধান আসলে কাকে বলে তা আমাদের প্রথমে জানতে হবে। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসক আসবার পূর্বে যে দক্ষতা ও জ্ঞানের দরকার হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাওয়া যায় তাকে বলে প্রাথমিক প্রতিবিধান। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক বিধানকারী কখনও চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না।

বিদ্যালয়ে এ জাতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হবে এবং ছাত্রছাত্রী এ কাজে অংশ গ্রহণ করে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। পরিচর্যা-কেন্দ্রের মত বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

বিদ্যালয়েই দুর্ঘটনা ঘটুক বা বাইরেই ঘটুক, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী ছাত্রছাত্রী যা করবে তা অতি শান্তভাবে করবে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করবে, এবং রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ব্যবস্থা করবে। রোগীর চারদিকে অযথা ভিড় জমতে দেবে না এবং চিকিৎসককে সত্বর ডেকে পাঠাতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা—প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান কেন্দ্রে নানা ধরনের রোগী আসতে পারে। কেটে যাওয়া, কালশিরা পড়া, সর্দি-গর্মি, শক বা স্নায়বিক আঘাত, অস্থিভঙ্গ, বৈদ্যুতিক শক, অজ্ঞান, মূর্চ্ছা, জলে ডোবা, পোড়া, চোখে কোন কিছু পড়া, সাপ বা কুকুরের দংশন, বিষক্রিয়া প্রভৃতি অসুখে আক্রান্ত লোক আসতে পারে।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ—এসব রোগের জন্য প্রতিবিধানকারীর প্রয়োজন ডেটল, টিংচার আইওডিন, বেঞ্জিন, বরিক তুলা, বার্নল, স্মেলিং সলট, নোভালজিন টেবলেট, বিভিন্ন প্রকারের ব্যাণ্ডেজ, গজ, গরম জল করবার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

[আমরা কর্মশিক্ষা অংশে বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিবিধানের কথা আলোচনা করেছি। সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভাল করে পড়ে নেবে।]

৩। অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার দল

পরিচ্ছন্নতা ও গ্রামের লোক—অঞ্চল বলতে এখানে শুধু বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কথাই বলা হচ্ছে না। একটা স্কুলের আওতায় যদি একটি গ্রাম থাকে তাহলে সমগ্র গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাই হবে ছাত্রছাত্রীদের কাজ। তবে এখানে শুধু ছাত্রছাত্রীরা কাজ করবে না, গ্রামের লোকদের সাহায্যও গ্রহণ করতে হবে। উভয় পক্ষের আদান-প্রদান না হলে কাজটি সুসমঞ্জসভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না। গ্রামের লোক যদি মনে করে যে এ কাজ শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই, তাহলে ভুল করা হবে। বাইরে থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে কোনও কাজে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, যদি স্থানীয় লোকেদের সহায়তা না পাওয়া যায়। তাছাড়া যন্ত্রপাতিরও অনেক কিছু দরকার হয়, কাস্তে, কোদাল, খন্তা, কাটারি, ঝাড়ু, ঝুড়ি ইত্যাদি সাফাই কাজে প্রয়োজন। সব জিনিস সরবরাহ করা বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্থানীয় লোক তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যেমন কাজে সাহায্য করবে তেমনি যন্ত্রপাতি দিয়েও সাহায্য করবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সকলেই জানে যে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বাস করার মূলে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আমাদের চারপাশে যদি নোংরা জমে তাহলে আমরা সহজেই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হব এবং আমরা হব অসুস্থ। তাই স্বাস্থ্যসম্মত বাসের প্রথম সূত্র হিসেবে আমরা গ্রহণ করব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে।

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিছন্নতা দলে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নির্বাচিত নেতা এবং কিছু সদস্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মত সাফাই মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই দলে কয়েকজন নির্বাচিত নেতা থাকবে, এরা পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনা করবে, এবং সাহায্য করবেন ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন শিক্ষক। এই দলও মাসে মাসে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কারণ আমরা আগেই বলেছি, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এই কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অঞ্চল পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনেও সমগ্র বিদ্যালয় এগিয়ে আসবে। কিন্তু পরিকল্পনার কাজ করতেও তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। অতএব দলীয় নেতা ও সংসদের পরিবর্তন আবশ্যক। প্রতি দুমাসের জন্য একটি ইউনিট কাজ করতে পারে।

এখন নেতা-সংসদ কিভাবে পরিকল্পনা করবে এবং কিভাবে কাজ করবে, তাই হল বিবেচ্য।

পরিচ্ছন্নতার কার্যের বিভাগ—বলা বাহুল্য পরিচ্ছন্নতার কাজকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে—বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং গ্রামের পরিচ্ছন্নতার কাজ।

পরিকল্পনার গুরুত্ব—বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার কাজ চলবে প্রতিদিন এবং তার জন্য মাসিক পরিকল্পনা হবে সংক্ষিপ্ত এবং প্রতি সপ্তাহ শেষে পরবর্তী সপ্তাহের বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকবে। বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রী যাতে সাফাই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বড়লোক ও গরীব ছাত্রদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না। আমি কোন কোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা শুনেছি যেখানে বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের সাফাই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। শিক্ষকের এই দুর্বলতা অমার্জনীয়। সাফাই

কাজও শিক্ষা। এ শিক্ষা পুঁথিতে না হতে পারে, কিন্তু এর মূল্য ব্যক্তি-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই অভিজ্ঞতা লাভ করবে, এরূপ পরিকল্পনা করতে হবে।

পরিকল্পনা করাও কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই কাজটি পরবর্তী জীবনে তার খুব কাজে আসবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার একটি প্রাক্তন ছাত্রের কথা উল্লেখ করছি। ছাত্রাবস্থায় সে স্পোর্টসের নেতা বা মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। সে এমন সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে সকলের সহযোগিতায় একটি File তৈরি করেছিল, যা তৎকালীন অধ্যক্ষ অনেক দিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে দেখানর জন্য। বর্তমানে তার কার্যধারা অনুসরণ করে দেখেছি, তার সেই নিখুঁত পরিকল্পনা করার অভ্যাস এখনও যায় নি, এবং ভালভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কর্ম সম্পাদন—যাক সে কথা, বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের সাফাই কাজের পরিকল্পনায়, সমগ্র বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থান, শ্রেণীকক্ষ, আঙ্গিনা, অফিস, অন্যান্য কক্ষ, খেলার মাঠ, পুকুরের ধার, ইত্যাদি যতগুলি দিক আছে তার জন্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে, নেতা থাকবে এবং সাফাই কাজে ঝাড়ু, কোদাল, কাস্তে, খন্তা ইত্যাদি সব কিছুর জোগাড় থাকবে। জিনিসপত্রের জন্য বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ নির্দিষ্ট থাকবে যেটি হবে সাফাই সম্পর্কিত জিনিসপত্রের গুদাম ঘর। প্রতিদিন বিদ্যালয় বসবার ২৫ মিনিট পূর্বে সাফাই কাজ আরম্ভ হবে। ছাত্রছাত্রী বোর্ডে টাঙান কার্যসূচী দেখে নিজ নিজ কাজে, ঘণ্টার সাথে সাথে চলে যাবে এবং ১৫ মিনিটের ঘণ্টার শেষে কাজ সমাপ্ত করে, হাত পা ধুয়ে জিনিসপত্র যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে নিজ নিজ ক্লাশে চলে যাবে।

কর্মসম্পাদনের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নেতারা কর্মীদের দিয়ে ঠিক মত কাজ করিয়ে নেবে। কোন ছাত্রছাত্রীই যাতে কাজে কোনরূপ গাফিলতি প্রদর্শন না করে সেদিকে নেতাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমগ্র সাফাই কাজের মূল্যায়ন করবে বিভিন্ন ভাগের নেতারা এবং কোনও প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিলে তা পরদিন ঠিক করে দেওয়া হবে।

অঞ্চল সাফাই—এবার গ্রাম সাফাইয়ের কাজে আসা যাক। গ্রাম

সাফাই বিশেষ ছুটির দিনে, যথা নেতাজীর জন্মদিনে, প্রজাতন্ত্র দিবসে, গান্ধীজীর মৃত্যু তিথিতে, স্বাধীনতা দিবসে, গান্ধীজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হবে। মাসের দুটি রবিবারে কাজ হবে।

সমাজসংযোগ—প্রতি রবিবারে সমগ্র গ্রামে সাফাই কাজ করা হবে না। অঞ্চল বেছে নিয়ে পক্ষান্তে সাফাই কাজ করতে হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবে সেই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্ক অধিবাসীরা। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একজন বা দুজন এ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন। এর জন্যও পূর্ব-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। অঞ্চল পরিদর্শন করা এবং অঞ্চলে কি কি কাজের প্রয়োজন, যথা—রাস্তা মেরামত, ডোবা ভরাট, ড্রেন পরিষ্কার, পুল মেরামত এবং আরও অন্য কিছু। তারপর করতে হবে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীর তালিকা এবং অঞ্চলস্থ যারা কার্যে অংশ গ্রহণ করবে, তাদের তালিকা। তাদের সাথে আগেই যোগাযোগ করতে হবে। একেই বলে সামাজিক উৎস (Community Resources)কে কাজে লাগান। তাছাড়া আরও একটি বিশেষ দিক আছে। সমাজে হয়ত ছুতার মিস্ত্রী আছেন, তাঁর কাছে সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে দাবী জানালে তিনি হয়ত দু-এক ঘণ্টার কাজের জন্য অগ্রসর হয়ে আসবেন এবং যেসব ছাত্র পুল মেরামত করবে, তাদের কাজে সাহায্য করতে পারবেন। এদিকে ছাত্রদের মধ্যে সকলেই কর্মশিক্ষা লাভ করেছে, হাতে-কলমে কাজ করতে শিখেছে, তারাও মিস্ত্রীর অধীনে কাজ করে আরও লাভবান হবে।

পরিকল্পনা—সমাজকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করবার পর আঞ্চলিক ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র কর্মীসংখ্যা জানা গেল। তারপর কর্মের বিভিন্ন রূপ ও গুরুত্ব অনুযায়ী সমগ্র কর্মীসংখ্যা ভাগ করতে হবে এবং তা তালিকায় লিপিবদ্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুলেটিন বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, আর সমাজকর্মীদের কোথায় কি কাজ তা জানিয়ে দিতে হবে। কাজ করতে শুরু করে যাতে সময়ের অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অঞ্চল সাফাই রবিবার ছুটির দিনে যখন হবে তখন কর্মের কাল হবে বেলা ৭-৩০ থেকে ৯-৩০ পর্যন্ত। এর বেশি নয়। বর্ষাকালে কিছুদিন হয়ত কাজ করা যাবে না। সাফাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও আগেই ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ উপকরণাদি পাবে বিদ্যালয় থেকে এবং আঞ্চলিক কর্মীরা নিয়ে আসবে তাদের নিজ নিজ হাতিয়ার। আসলে কর্মের একটা

মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে কাজের লোকেরও অভাব হবে না, উপকরণাদিরও অভাব হবে না।

বিদ্যালয়ের সাফাই কাজের যেভাবে মূল্যায়ন হয়েছে, সেভাবেই আঞ্চলিক সাফাইয়ের মূল্যায়ন হবে।

নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের জন্য দল

পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষরতা—পূর্বেই বলা হয়েছে সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে সমাজ। একে একটা Two way traffic ও বলা যেতে পারে। গ্রামের লোকদের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখা যেমন শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন, তেমনি পশ্চিমবাংলার অগণিত নিরক্ষর নরনারীকে সাক্ষর করে তোলাও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গে এখন সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৩৫ জন, এবং বেশির ভাগ (অর্থাৎ শতকরা ৭০।৮০ জন নিরক্ষর) পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলিতেই বাস করে। অতএব গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষদের সাক্ষর করার ভার গ্রহণ করবে। সাক্ষরের সংজ্ঞা কি ? সাক্ষর তাকেই বলা হয় যে একখানা চিঠি পড়তে পারে এবং তার উত্তর লিখতে পারে। একাজটুকু নিরক্ষর সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের করতেই হবে।

প্রচার—কিভাবে কাজ হবে সেই হচ্ছে সমস্যা। বয়স্ক লোকেরা কি পুত্র কন্যা সদৃশ ছেলেমেয়ের কাছে কিছু শিখতে চাইবে ? বয়স্কদের মর্যাদায় আঘাত লাগবে না কি ? কিন্তু স্বাধীন দেশে সকলেরই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। বয়স্কলোকদের বোঝাতে হবে যে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংসারিক জ্ঞানের তুলনায়, বিচার বুদ্ধির তুলনায় হয়ত মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় ; কিন্তু তারা যতটুকু বিদ্যা আহরণ করেছে, তার সামান্য অংশ তারা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করতে পারবে। আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়া বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। তারা ত শিশুদের পড়াচ্ছে না। শিশুদের পড়াতে হলে যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন, এখানে ত সে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এখানে ছাত্রছাত্রী সরাসরি বয়স্ক শিক্ষার্থীকে পড়াতে অগ্রসর হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে লেখাপড়ার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেখবেন

না, কে তাঁদের পড়াচ্ছে। কিভাবে পড়ছেন, কি লিখছেন তাই হবে তাঁদের বিবেচ্য বিষয়। শিখবার প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হলে এবং লেখাপড়া যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় এ মনোভাব নিরক্ষর বয়স্কদের মনে জাগ্রত হলেই কোন সমস্যা থাকবে না। এই মনোভাব জাগ্রত করবার জন্য বিদ্যালয়সমাজও চেষ্টা করবেই; কিন্তু বেশি চেষ্টা করবে গ্রাম্য শিক্ষিত সমাজ। তাঁরা যদি নিরক্ষর বয়স্কদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেন, তাহলে তাঁরাও অগ্রসর হয়ে আসবেন। তাছাড়া শিক্ষিত সমাজও ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টার সঙ্গে অংশভাগী হবেন, তবে ছাত্রছাত্রীরাও উৎসাহ পাবে। পক্ষান্তরে নিরক্ষর বয়স্কদের মনেও মর্যাদাবোধ আর ততটা দেখা দেবে না।

নিরক্ষর বয়স্কদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য চালাতে হবে। সাক্ষর, নিরক্ষর, গরীব, বড়লোক সকলেই আজকাল খুব সিনেমা দেখে। নির্বাক ছবির যুগে ঘটনার বিবরণ দেবার জন্য কিছু লেখা (Caption) থাকত। তখন সিনেমা দেখতে হলে কিছু পড়তে হত। তখন সাক্ষরতা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে সিনেমা কার্যকরী হত বটে। কিন্তু তখন সিনেমা দেখত কজন লোকে? বর্তমানে প্রায় সবাই দেখে, দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ চিত্র সবাক। এই সিনেমাগুলির মাধ্যমে শ্লাইড দিয়ে প্রচার কার্য করা চলে। শ্লাইডে কিছু লেখা থাকবে না। শুধু থাকবে ছবি। ছবিতে বয়স্করা পড়ছে। আরও এই সংক্রান্ত নানা রকম শ্লাইডের ব্যবস্থা থাকবে। যারা পড়ছে তারা লেখাপড়ার অন্য কাজও করছে, খবরের কাগজ পড়ছে ইত্যাদি। সিনেমাতে শুধু শ্লাইড নয়, সিনেমাতে বিজ্ঞাপন কার্যক্রমে ছোট ছোট ছবির রীল দেখান হয়। Film Division যদি সেই জাতীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ছবির রীল তৈরি করে দেন এবং প্রত্যেক সিনেমা গৃহে তার প্রদর্শন আবশ্যিক করে দেন, তাহলে ভাল কাজ হবে বলে আশা করা যায়। নিরক্ষরতা সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটা সর্বভারতীয়। অতএব এর প্রচার সর্বপ্রকারে দরকার।

শুধু সিনেমাতে নয়, রেডিও মারফৎ এর প্রচার প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনার কথা রেডিওতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমস্যাও প্রচার আবশ্যক। বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রাম গ্রামবাসীদের গরীব, বড়লোক, সাক্ষর, নিরক্ষর সকলের কাছেই খুব প্রিয়। সেখানে এবিষয়ে কিছু ফিচার দেওয়া চলে। তাহলেও কিছু প্রচার হবে।

চারদিক থেকে প্রচার হলে, নিরক্ষর বয়স্করা লেখাপড়ার গুরুত্ব হয়ত কিছুটা বুঝতে পারবেন। তখন বিদ্যালয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের কিছুটা সুবিধা হবে।

ব্যবস্থাপনা—কি ভাবে কাজ হবে এখন হচ্ছে তাই সমস্যা। ছাত্রদের পক্ষে নিজেদের পড়াশুনার উপর একাজ করা একটু কষ্টকর বই কি। কিন্তু অবসর সময়ে যদি তারা একাজটুকু করে তাহলে খুব ভাল হয়। সব ছাত্রদেরই ত একসাথে প্রয়োজন হবে না। এখানেও পর্যায়ক্রমে ছাত্ররা পড়াবে। ছাত্রদের অবসর সময় কখন? বিকেলবেলা খেলার সময় তাদের অবসর সময়, কিন্তু খেলা বাদ দিলে ত চলবে না। তবু সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন বাদ দিয়ে তাদের একাজ করতে হবে। অনেকের ভাগে সপ্তাহে হয়ত একদিনও একাজ পড়বে না। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরক্ষর বয়স্কদের লেখাপড়া শেখান চলতে পারে। বর্তমানে আলোর সমস্যাও ত কম নয়, তাই দিনে দিনে কাজ শেষ করাই ভাল। বিদ্যালয় গৃহের বিভিন্ন কক্ষই হবে নিরক্ষর বয়স্কদের লেখাপড়া শিক্ষার স্থান।

এক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে—নিরক্ষর বয়স্করা ত নিষ্কর্মা নয়। তাদেরও ত কাজ আছে, তারাও কাজ করে, উপার্জন করে। তারা ত রাত্রে তাদের অবসর সময়ে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য দাবী করতে পারে। খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষিত সমাজ এগিয়ে আসবেন এবং কোন কোন বয়স্ক ছাত্রের সহযোগিতায় কর্ম সম্পাদন করবেন। একথা বলাই বাহুল্য যে ছাত্রছাত্রীদের সমাজসেবী করতে গিয়ে তাদের পড়াশুনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া চলবে না। তারা রাতের কাজে যে যতটুকু পারে তাই করবে, তাতে পরিকল্পনা করে করলে কারও ভাগেই বেশি চাপ পড়বে না।

লেখাপড়া শিক্ষাদানের পদ্ধতি—নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য লেখাপড়া শিক্ষাদানের জন্য একটা পদ্ধতি আছে, সে পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দিতে হবে। পদ্ধতি খুব কঠিন নয়। প্রথমে নিরক্ষর বয়স্কদের আগ্রহের কেন্দ্র কি তা জানতে হবে। পশ্চিমী দেশসমূহে খেলাটা হচ্ছে সর্বস্তরের আগ্রহ কেন্দ্র, অতএব সেসব জায়গায় খেলা থেকে লেখাপড়ার সূত্র ধরা যায়। আমাদের দেশে এমন আগ্রহের কেন্দ্র কি? আমাদের জীবনের সমস্যা হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য সমস্যা আমাদের ভারত সমাজকে চিন্তিত করে তুলেছে। তাই খাদ্যের মূল্যমানকে অবলম্বন করেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অ, আ, ক, খ

দিয়ে শুরু করতে নিরক্ষর বয়স্করা মোটেই আগ্রহ বোধ করবে না। তাই আগ্রহকেন্দ্রিক অবলম্বন নীতি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ যদি কয়েকটি পাঠ তৈরি করে দেন, যাতে সমগ্র বর্ণমালা এবং সংখ্যা গণনা শিখতে পারা যায় তাহলে ভাল হয়। ছাত্রছাত্রীরা এবং গ্রামের কর্মীরা যাঁরা শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়েছেন তাঁরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটা পথ খুঁজে পাবেন।

৫। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দিবস পালন

সূচনা—পুস্তকের এই অংশে প্রথম চারটি বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। বিষয়গুলি সরাসরিভাবে গ্রামসেবার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিবস পালন কি করে সমাজ সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সে বিষয়ে হয়ত সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে।

বিদ্যালয়ে যে সব অনুষ্ঠান পালিত হয়, তার সাথে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছে, এবং ছাত্রছাত্রীরা এসেছে গ্রাম থেকেই। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাই বিদ্যালয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। গ্রামীণ সমস্যা যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে ব্যাপক ভাবে যুক্ত, সেইরূপ বিদ্যালয়ও গ্রামবাসীকে তাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিছু নূতন ধ্যান-ধারণার খোরাক যোগাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সাধারণ মানুষ দেশের অতীত যুগের বীরদের সঙ্গে, সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে, ধর্মসংস্কারকদের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয়, এবং অবদান সম্পর্কে ত নয়ই। বিদ্যালয়ে যদি এসব লোকের জীবনী শুধু পুঁথিগত ভাবে শিক্ষা না দিয়ে জন্মোৎসব বা তিরোভাব দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা যায়, এবং গ্রামের সাধারণ লোক যদি সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে যোগদান করে, তাহলে তাদের চোখের সম্মুখে এক নূতন জগতের আলোর ব্যবস্থা করা যাবে। এত এক ধরনের গ্রামসেবাই। তাছাড়া সমাজের অনেক শিক্ষিত লোকও এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অবদান রাখতে পারেন। ফলে বিদ্যালয়সমাজ ও গ্রাম্যসমাজ উভয় পক্ষই নানাভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

অতএব বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের গুরুত্ব কতখানি, তা অনায়াসেই বুঝতে পারা গেল। অতএব বিদ্যালয় কিভাবে ঐ উৎসব-অনুষ্ঠান পালন

করবে, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনার মধ্যে গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ সেই যোগাযোগই বিদ্যালয়সমাজের উদ্দেশ্য।

(ক) বীর নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

আমাদের দেশে বীর নেতাদের (hero) অভাব নেই। দুশো আড়াইশ বছর ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। এর মধ্যে আমাদের দেশে বহু বীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের অবদান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সকলের জন্ম বা তিরোধান দিবস বিদ্যালয়ে পালন করা যাবে না, কারণ তাতে অনেকটা সময় ব্যয়িত হবে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী শেষ করা সম্ভব হবে না। অতএব বীরপূজা হিসেবে গুটিকয়েক মহান্ বীরের সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আলোচনা সভা বসলে ভাল হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিন বা তিরোধান দিবসের নিকটবর্তী প্রথম শনিবারে বেলা দুটোর সময় তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা সভা বসতে পারে। গ্রামের লোক এই আলোচনা সভায় নিমন্ত্রিত হবেন। তাঁরা আলোচনা শুনবেন, যদি কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তাও করতে পারেন। এমন সব বীরের নাম কতই বা বলা যাবে ? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে সকলের সম্বন্ধে আলোচনা সভার আয়োজন করা চলবে না। বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন বীরপূজা যদি হয়, তাহলে গ্রামের জনসাধারণ কিছুটা তাঁদের সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে। তবে আর একটি উপায়ে এঁদের সামগ্রিক পরিচয় চলতে পারে। সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে। সেখানে থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস ক্রমিক ছবির মাধ্যমে। এর জন্য মানচিত্র, ডায়াগ্রাম, এবং অন্যান্য জিনিসের যে ছবি প্রয়োজন, তাও প্রদর্শনীতে সন্নিবেশিত থাকবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী গড়ে উঠতে পারবে। তারপর বিকেলের দিকে বসবে সাধারণ সভা। সেই সভায় আলোচিত হবে সংগ্রামী বীরদের জীবনী। গ্রামের লোকগণ যাঁরা এবিষয়ে ওয়াকিবহাল, কিংবা বয়স্ক, বৃদ্ধ যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান

করেছেন তাঁরা সভা পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে পারেন। ফলে সভার কাজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

এখানে বীরপূজার একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

নেতাজী সুভাষের জন্মদিবস পালন

নেতাজী সুভাষ বীর ও সর্বজনপূজ্য এবং তাঁর জন্মদিন বিদ্যালয়ে কিভাবে পালন করা হবে তার একটি খসড়া নিম্নে প্রদান করা হল।

বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রছাত্রীসমাজ শ্রেণী ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী একাজে অংশ গ্রহণ করবে। সকলেই এক রকম কাজ করবে না। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র যা পারবে না, তা হয়ত অষ্টম শ্রেণী করতে পারবে। অতএব বয়স ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মবণ্টন করতে হবে। তখন এ সম্পর্কে কাজ কি হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা যাক।

১। নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে বিদ্যালয় গৃহ সজ্জিতকরণ।

২। জন্মদিনে প্রভাত ফেরী।

৩। পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা।

৪। নেতাজীর জীবনকে অবলম্বন করে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

৫। বিদ্যালয় অঙ্গনে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র মাটি দিয়ে মডেল তৈরি করা; এবং নেতাজীর ইম্ফলের মাটিতে প্রবেশ করে পতাকা স্থাপনের নির্দেশনা।

৫। সন্ধ্যায় আলোকচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা, কিংবা নেতাজীর জীবনের কোন অংশ নিয়ে নাটকাভিনয়।

এই কর্মতালিকাকে অবলম্বন করে জন্মোৎসবের সাত দিন পূর্ব থেকেই কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মবণ্টন শুরু করতে হবে। শিক্ষকগণ ও ছাত্রছাত্রী সকলেরই প্রায় জানা আছে কার কোন কাজে দক্ষতা আছে, আগ্রহ আছে। অতএব রুচি, দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী কর্মবণ্টন করাই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত বিভাগের জন্য ছাত্রছাত্রী কর্মী পাওয়া যাবে। তবে প্রতেক দলের জন্য একজন করে গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতা স্থির করে দিতে হবে, যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ছাত্রছাত্রীরাই বিদ্যালয় গৃহ সাজাবে, সভামণ্ডপ তৈরি করবে, ভারতবর্ষের মডেল তৈরি করবে।

প্রভাত ফেরীর দল গান শিখবে এবং ড্রাম বাজানোর অনুশীলন করবে।

প্রদর্শনীর দল নেতাজী সুভাষের বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহ করবে, বাল্যকাল থেকে আই. এন. এর নেতৃত্ব গ্রহণ পর্যন্ত যত চিত্র আছে তা সব সংগ্রহ করতে হবে। নেতাজীর বিভিন্ন অবস্থার ছবি হয়ত এক স্থানে পাওয়া যাবে না। এর জন্য সংগ্রহ করতে বের হতে হবে। গ্রামে হয়ত অনেক শিক্ষিত লোকের গৃহে নেতাজীর নানা সংগ্রহ আছে। তাঁদের কাছে থেকে প্রদর্শনীর জন্য সেই নিদর্শনগুলো ধার করে আনতে হবে। যে সব ছাত্রছাত্রীর অঙ্কণে দক্ষতা আছে, তারা কিছু অঙ্কণ করবে, এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের আর্টের শিক্ষক কিছুটা সাহায্য করবেন। গ্রামে যদি কোন চিত্রশিল্পী থাকেন, তাঁর কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। শুধু ছবি সংগ্রহ করা বা ছবি অঙ্কণ করলেই চলবে না, ছবিগুলির ক্যাপশন লিখতে হবে। তার জন্য ভাল হাতের লেখার ছাত্রছাত্রী চাই। প্রদর্শনীতে নেতাজীর বাণীও থাকবে। চাইনিজ ইঙ্কে বড় বড় অক্ষরে অর্থাৎ ২½ সে. মিটার অক্ষরে লিখে প্রদর্শনীতে লাগাতে হবে।

দুপুরে নেতাজীর জন্মসময় শঙ্খধ্বনির ভিতর দিয়ে পালিত হবে। তারপরই উদ্বোধন হবে প্রদর্শনীর। প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উপস্থিত জনমণ্ডলীকে তিনি বলবেন ভাল করে নেতাজীর জীবনের চিত্রগুলি ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে। তারপর শুরু হবে প্রদর্শনী দেখা। একাজ বিকেল পর্যন্ত চলবে। গ্রামের লোক কিংবা গ্রামান্তরের লোক যাঁরাই আসবেন তাঁরাই যেন প্রদর্শনী দেখবার সুবিধা পান তা দেখতে হবে। প্রয়োজনে তার পরদিন পর্যন্ত প্রদর্শনী সাজান থাকবে।

বিকেলে ৩ টায় বসবে সভা। এই সভায় ছাত্রছাত্রীরা নেতাজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে প্রবন্ধ পড়বে। প্রবন্ধ লিখবার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকগণ প্রবন্ধগুলি স্থির করে দেবেন এবং এজন্য যেসব Source Book-এর প্রয়োজন তাও বেছে দেবেন।

শুধু ছাত্রাছাত্রীই নয়, গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেউ নেতাজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তে চান বা বক্তৃতা দিতে চান, তার জন্যও তাঁদের সাদর আহ্বান জানাতে হবে। শিক্ষকবর্গের কেউ বা প্রধান শিক্ষক সভা পরিচালনা করতে পারেন, যদি সমাজ থেকে কোন সুযোগ্য ব্যক্তি না পাওয়া

যায়। বাইরে থেকেও সভাপতি আমন্ত্রণ করে আনা চলতে পারে। অর্থাৎ সভার কাজ এমনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে গ্রাম্য সমাজ ও বিদ্যালয় সমাজ উভয়েই প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হয়। গ্রামের সর্বসাধারণকে এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হবে।

সন্ধ্যার কার্যক্রম আরও বেশি আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করবে গ্রামবাসীদের। প্রথমে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান হবে। পরে পশ্চিম-বঙ্গের প্রচার বিভাগ কর্তৃক যদি নেতাজীর জীবনী সম্পর্কিত কোন তথ্য চিত্র দেখান সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা হবে। গ্রামবাসীরা ও ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায় এটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে দেখবে। আর যদি তার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা নেতাজীর জীবনী অবলম্বন করে নাটিকা রচনা করে তার অভিনয় করবে। এতে সকলেই আনন্দ পাবে।

নেতাজীর জন্মদিনটি সর্বরকমে সার্থক করে গ্রামীণ সমাজ ও বিদ্যালয় সমাজের কাছে পূর্ণমাত্রায় শিক্ষণীয় করে তুলতে হবে।

বিদ্যালয়ে বীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্ম বা তিরোধান দিবস বৎসরে ২।১টি মাত্র এভাবে পালিত হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে যে প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসেই দেশের সমস্ত বীর নেতাদের স্মরণ করার প্রশস্ত দিন।

(খ) জাতীয় সংহতি

জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার পূর্বে আমরা ভাবগত সংহতির আলোচনা করব। জাতীয় সংহতির পরিপূরক হচ্ছে ভাবগত সংহতি।

ভাবগত সংহতির প্রকৃত অর্থ—ভাবগত সংহতির অর্থ হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে জাতির সাধারণ উদ্দেশ্য ও আদর্শ হবে এক এবং তার স্থান থাকবে আংশিক কোন কিছুর উর্ধ্বে। এক কথায় বলতে গেলে ভাবগত সংহতি ইঙ্গিত করছে একাত্মবোধকে। সকলই একীভূত হয়ে যাবে দেশের স্বার্থে।

ভাবগত সংহতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, আমরা ভারতবাসীর সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতা মনোভাবযুক্ত সাম্প্রদায়িক ও নির্দিষ্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণের প্রতি একান্ত মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকব না। কারণ,

আমাদের জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। আসুন আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকেরা সোজা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই এবং ভারতীয় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সংহতি আনায়ন করি।*

ভাবগত সংহতি কেন?—ভারত বিরাট দেশ। বহু জাতি, বহু বিশ্বাস, বহু ধর্মাবলম্বী, বহু ভাষায় এই বিরাট উপ-মহাদেশ। ভারতের সমস্ত নরনারী সমগ্র দেশের মঙ্গলকে সম্মুখে উপস্থাপিত করে একীভূত হবে; এই হচ্ছে একান্ত কাম্য। যা আমাদের একীভূত হতে বাধা দেয়, তাকে দমন করে, সমগ্র ভারতে এক জাতীয় মন গঠন করাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।

ভাবগত সংহতি ও শিক্ষা—আমাদের ভাষা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্ম, ইত্যাদি যাই হোক না কেন আমাদের সমস্ত ভারতবাসীকে একটি বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারা যাবে, যদি একমাত্র সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ভাবগত সংহতির প্রাথমিক অধিবেশনে ডক্টর শ্রীমালী (Dr K. L. Srimali) বলেছেন, যদি আমরা বর্তমান অবস্থায় সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করে থাকি যে, আমাদের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন, তাহলে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হচ্ছে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই উদ্দেশ্যে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। দেশের শিক্ষাগত নীতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা, জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়, এবং বর্তমানে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে আমাদের যুব জীবনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধন করা। জাতীয় আদর্শ উপলব্ধির ও উন্মেষ সাধনের জন্য বিদ্যালয়গুলিই হবে বাহক ও মাধ্যম। শিক্ষা যুবাকে এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে, তারা দেশের ও জাতির ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা। দুঃখ ও আনন্দ, দ্বন্দ্ব ও নিষ্পত্তি, নিষ্ফলতা ও কৃতিত্ব, ভ্রান্তি ও বিচক্ষণতা সব কিছুর সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং তারা গর্ব ও প্রীতির

---

* Jawharlal Nehru—We should not be parochial, narrow minded, Provincial, Communal, caste minded because we have a mission to perform. Let us, the Citizens of the Republic of India, stand up straight, with straight backs and look up at the skies, keeping our feet firmly planted on the ground, and bring about this synthesis, this integration of the Indian people.

সঙ্গে সমস্ত দেশকে গ্রহণ করবে এবং সমস্ত শক্তি ও ইচ্ছা দিয়ে তারা সেবা করবে।[১]

ভাবগত সংহতির ক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ—ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাবগত সংহতি লাভের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে:

(১) নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠ্যক্রম রচনা।

(২) সহপাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) সমাজবিদ্যা পাঠের প্রতি গুরুত্ব।

(৪) জাতীয় সঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন।

(৫) জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা।

(৬) জাতীয় দিবস পালন।

আমাদের জাতীয় দিবসগুলি হচ্ছে ২৬শে জানুয়ারী (প্রজাতন্ত্র দিবস), ১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনত দিবস) এবং ২রাঅক্টোবর (গান্ধীজীর জন্মোৎসব)। জাতীয় দিবসগুলিতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পাঠ করাতে হবে। এগুলিই হচ্ছে জাতীয় সংহতির প্রতিজ্ঞা।

"ভারত আমার দেশ, সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই ও বোন। আমি আমার দেশকে ভালবাসি এবং এর মূল্যবান ও বৈচিত্রপূর্ণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমি গর্বিত। আমি এর উপযুক্ত হতে সর্বদাই চেষ্টিত হব।"

"আমি আমার মাতাপিতা, শিক্ষক বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব এবং প্রত্যেকের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করব। আমি প্রাণীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করব।"

"আমি আমার দেশ ও দেশের লোকেদের অনুরাগ ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি। তাদের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিতেই আমার কেবল সুখ।"[২]

---

1 Dr K. L. Srimali Schools must be instruments for the realisation of National ideals...Education must make the growing youths realise that they are indissoluvely bound to the nation and its destiny, its tragedies and joys, its conflicts and settlements, its failures and achievements, its mistakes and wisdom and they should come to regard it with pride and love and the impelling desire to serve it wholeheartedly.

2 The Pledge—India is my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall try to be worthy of it.

I shall give my Parents, Teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.

To my country and my people, I pledge my devotion. In their wellbeing and prosperity alone lies my happiness.

এই প্রতিজ্ঞা শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই পাঠ করবে না, জাতীয় সংহতি দিবসে পতাকা উত্তোলন কালে উপস্থিত সকলেই এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করবে। আমরা সকলেই একাত্মবোধে জাগ্রত হব—এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

(৭) এ সব ছাড়াও বিদ্যালয়ের আর একটি কার্যক্রম আছে। এবং সেটি হচ্ছে মুক্তাঙ্গনে অভিনয়। প্রতি বিদ্যালয়ে বৎসরে অন্ততঃপক্ষে চারবার মুক্তাঙ্গনে নাটকাভিনয় করতে হবে। প্রাচীন ইতিহাসকে অবলম্বন করে অন্ততঃ একটি নাটকাভিনয় চাই। তা থেকে আমাদের অতীতের কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে সকলে অবহিত হতে পারবে। অন্যান্য নাটকাভিনয়গুলি জাতীর সংহতির ভাববর্ধক হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

(৮) বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য, গঠনমূলক কাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে জাতীয় সংহতি দিবসে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সংহতি প্রচারের এটি হচ্ছে একটি বিশেষ মাধ্যম।

জাতীয় সংহতির ও ভাবগতি সংহতির প্রচেষ্টা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবাসীর মনকে এদিকে উন্মুখ করে তুলতে হবে—জোর করে, ভয় দেখিয়ে নয়, অনুরাগ বৃদ্ধি করে। বিদ্যালয়ই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ছাত্রছাত্রীগণ দীক্ষিত হতে পারে এবং তার ভাবধারা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে।

(ক) সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম সংস্কারক দিবস

একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, যাঁর নাম হচ্ছে টি, পি, নান (T. P. Nunn)। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, "বিদ্যালয়ই হচ্ছে জাতির প্রাণশক্তির কেন্দ্র। যার প্রকৃত কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি দৃঢ় করা, ঐতিহাসিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, অতীতের গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাজ্ক্ষাকে জীইয়ে রাখা। বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই সমগ্র জাতি, জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলকর শক্তিসমূহের উৎস কোথায়, সে সম্বন্ধে সচেতন হবে। দেশের মহাপুরুগগণ যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন, সেই স্বপ্নের অংশ গ্রহণ করতে এইগুলিই দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে। তাদের আত্মসমালোচনার আকাজ্ক্ষা জাগ্রত হবে, স্বীয় আদর্শের সংশোধন এবং কর্মশক্তির পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করবার শক্তি আনবে।"

নান সাহেবের এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারছি দেশের মহাপুরুষগণ আমাদের চিন্তাধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছেন।

আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম সংস্কারকের অভাব নেই। তাঁরা যুগে যুগে আমাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে এসেছেন তা আমাদের জানা একান্তভাবেই কর্তব্য। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, আমরা কিভাবে নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছে গেছি। তাছাড়া তাঁদের জীবন থেকে আজও অনেক কিছু শিখবার আছে, তাঁদের আদর্শকেই আমাদের সম্মুখে রেখে আমাদের নূতন জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

এই কারণেই বিদ্যালয়ে ধর্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকদের জীবনী বিস্তৃত-ভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্মোৎসবকে আমরা যেমনভাবে নেতাজী জন্মোৎসব পালন করে এসেছি, তেমনভাবে পালন করতে পারব না। পাঠ্যক্রমের কাঠামোর মধ্যে তেমন বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবও নয়। তবে কিছু কিছু করা নিশ্চয়ই যেতে পারে এবং করা সম্ভবও।

বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে সভা, ভাষণ, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সন্ধ্যায় বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বন করে নাটকাভিনয় ইত্যাদি করা সম্ভব এবং এসব অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠান। গ্রামের লোক দেখবে, শুনবে ও অতীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মক্ষণ পালন করবার জন্য Nativity Playর ব্যবস্থা করা চলে। Santa Clausএর আগমন নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা চলে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই এসব অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

ফতেহা দোয়াজ দাহাম উপলক্ষে হজরত মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধীয় আলোচনা-সভা সকলের পক্ষেই বিশেষ উপভোগ্য হবে।

তাছাড়া চৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে সভা ও ছোট ছোট নাটকাভিনয় চলতে পারে। অল্প প্রস্তুতিতে এসব যাতে সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু গ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষা অতি অবশ্যই করতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদির জন্মতিথিতে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজ সংস্কারকদের জীবনীও আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। রাজা রামমোহন

রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদির জীবনীও আলোচনা করা প্রয়োজন। জন্মতিথির নিকটবর্তী শনিবারের ছুটির পর এসব আলোচনা সভা হলেই ভাল। তাহলে ছাত্রছাত্রী সকলেই যেমন যোগদান করতে পারবে, তেমনি যোগদান করতে পারবে গ্রামবাসীরা।

(খ) বিজ্ঞান দিবস

আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসু "শিশু ও বিজ্ঞান" বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন—"গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রত্যেকেই আমাদের সত্যস্বরূপে পৌঁছে দিতে চায়। আমাদের মধ্যে যদি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা যদি জাগ্রত হয়, তবে আর সব কিছুই সহজ হয়ে আসবে। তখন শিক্ষা দেবার পদ্ধতি নিয়ে আর গোলে পড়তে হবে না।"

এই প্রসঙ্গে আরও কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারেও আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারিনি।"

এসব কথা বলতে গিয়ে আচার্যদেব আরও বলেছেন যে আমরা 'বস্তুর পাহাড়' ছাত্রদের কাছে তুলে ধরেছি, মনোগ্রাহী করতে পারিনি। ফলে পদে পদে ছাত্ররা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

আমরাও বিজ্ঞান শিক্ষাকে নানাভাবে মনোগ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করব। দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ সদাসর্বদা এসে যাচ্ছে, তা সহজভাবে ছাত্রছাত্রীদের কেন সাধারণ লোকদেরও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। বিজ্ঞানের বহিরাবরণের কঠিন স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয় একটি উপায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খুবই মনোগ্রাহী করে তুলতে পারে। সাধারণ লোকের জ্ঞানসীমার মধ্যে তাকে আনতে পারে।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংখ্যা খুবই অল্প। এঁদের মধ্যে আছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সতেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। সমগ্র দেশে আরও অনেক বিজ্ঞানী আছেন। এঁদের মধ্যে কোন কোন বিজ্ঞানীর স্মৃতিচারণ উৎসব পালন করা যেতে পারে। বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা চলবে না। শুধু হবে তাঁর স্মরণ ও অবদানের কথা।

ধরা যাক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মরণ সভার ব্যবস্থা করা গেল।

আচার্য বসুর অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের কথা বিশ্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আচার্য বসুর জীবনী ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা চলবে। সমাজে যদি কোন বিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকেন, তবে তাঁকে Resource Person হিসেবে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে। নিকটবর্তী স্থান থেকে বিজ্ঞানীদের নিমন্ত্রণ করে আনা যেতে পারে। তাঁরা এমনিভাবে আচার্য বসুর অবদানের কথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন যা ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের পক্ষেও সহজবোধ্য হবে। একটি বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এতে সময় বেশি লাগবে না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী আশ্রয়ী সময়-পত্রিকা ব্যাহত হবে না। এসব কাজ হবে রবিবারে, যখন বাইরের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে।

বিদ্যালয়ে বৎসরে কয়েকবার বিজ্ঞান দিবস পালন করতে হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর জীবনী ও অবদানের কথা তাতে জানা যাবে। প্রয়োজনবোধে চলচ্চিত্র বা এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে বিষয়বস্তু বোঝান চলবে। এসবের মাধ্যমে বিজ্ঞান আলোচনা চললে ছাত্র-ছাত্রী সম্প্রদায় ও গ্রামের সাধারণ লোকের পক্ষে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা সহজ হবে।

ভারতের আণবিক পরীক্ষার দিনটি বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হতে পারে। আণবিক যুগে জনস্বার্থে আণবিক শক্তির অবদান ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণ লোকেও আণবিক শক্তি কি তা জানতে পারবে।

দ্বিতীয় ভাগ

বিদ্যালয়ে কর্ম-সম্পাদন

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু মামুলি বৌদ্ধিক শিক্ষাই লাভ করবে না- তারা কর্মশিক্ষা লাভ করবে। খেলাধুলা করবে, সমাজসেবা করবে এবং বিদ্যালয়কে ভালবেসে বিদ্যালয়কে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করবে।

বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে, এবং ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করবে। বিদ্যালয়ের দুটি দিক আছে, একটি হচ্ছে বাইরের দিক, অপরটি হচ্ছে পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত দিক। আমরা পুস্তকের এই বিভাগে বিদ্যালয়ের বাইরের দিক অর্থাৎ বাইরের সৌন্দর্য বিধানের দিক এবং পাঠ্যক্রম ও সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির সহায়ক ছাত্রছাত্রীদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বিধান

সমাজের ও ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব সম্পত্তি হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে সুন্দর করে রাখা সমাজেরত বটেই ছাত্রছাত্রীদেরও বিশেষ কাজ।

বিদ্যালয়ের কর্ম সম্পাদনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধান করতে পারে তা আলোচনা করে দেখব।

বিদ্যালয়ে চুণকাম ও সংস্কার সাধন—বিদ্যালয় গৃহ যদি পাকা বাড়ী হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের বাইরের দিকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিদ্যালয় চুণকাম ও রং করার জন্য সরকার থেকে যে সামান্য অর্থ পাওয়া যায় তাতে বিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন বা সৌন্দর্য বিধান মোটেই সম্ভব নয়। অতএব একাজে গ্রাম্য সমাজ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের কর্ম অভিজ্ঞতা হচ্ছে। অতএব তারা পরিশ্রমের কাজ করতে মোটেই পিছিয়ে যাবে না। কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে এবং শিক্ষকবৃন্দ ও সমাজের অভিভাবকগণ যদি অগ্রণী হন তাহলে বিদ্যালয় সংরক্ষণ ও সুসজ্জিত করণের কাজ ছাত্রছাত্রীরাই ভালভাবেই করতে পারবে।

বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫।৬ শত ছাত্রছাত্রী থাকে, তাদের বড়দের মধ্যে যদি বিদ্যালয় গৃহের চুণকাম করার ভার অর্পণ করা যায় তা তারা করতে পারবে। Slab pottery নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইটও অনেক তৈরি করতে শিখেছে। ইটগুলি স্থানীয় কুম্ভকারদের সহযোগিতায় পুড়িয়ে নিয়ে বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার সাধন করা যেতে পারে। সমাজের দক্ষ কারিগরদের কিছু সাহায্য চাই বই কি। চুণ জলে গুলে তাতে নীল মিশিয়ে ভালভাবে ঘুঁটতে হবে, তারপর দেওয়ালে প্রলেপ দেওয়ার মত পাটের বড় বড় তুলি তৈরি করে, সেই তুলি দিয়ে চুণকাম করা চলে। পরে রং মিশিয়ে চুণকামের উপর রং দেওয়া

চলে। শ্রেণী কক্ষের ভিতরটাও এরূপভাবে চূণকাম করা যাবে। মনে রাখতে হবে চূণকামের পূর্বে বাইরের ময়লা ঘসে ফেলতে হবে।

এই গেল বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বাইরের দিক। অবশ্য এ কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবর্গ ও গ্রাম্য সমাজ সমবেত পরিকল্পনা করে কাজ করবেন।

আলপনা ও প্যানেলের কাজ—এবার ভিতরের সৌন্দর্য বিধান। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বিধানের একটি বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে সিঁড়ির ধারে, বারান্দায়, করিডরে, শ্রেণীকক্ষে এবং অন্যান্য কক্ষগুলি দেওয়ালের মেঝে থেকে ২০ সে.মি. উঁচু পর্যন্ত প্যানেলে দাগ টেনে আলপনা দেওয়া। এ বিষয়ে আর্টের শিক্ষক বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন। তিনি একটি ৪০ সেমি.×২০ সেমি. পেষ্টবোর্ড কেটে তাতে আলপনার ঢংএ স্টেনসিল কেটে, প্যানেলে বসিয়ে বসিয়ে সাদা রঙ লাগাবার ব্যবস্থা করবেন। চকের গুঁড়োর সাথে গঁদ মিশিয়ে ২½ সেমি, তুলি দিয়ে স্টেনসিলে সাদা রঙ বুলান যায়। পাশে পাশে যদি এভাবে আঁকা হয়ে যায় তাহলে সুন্দর একটি প্যাটার্ন গড়ে উঠবে। ফুল-লতা-পাতায় ছাত্রছাত্রীরা ছোট তুলি দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারবে। এত ছাত্র-ছাত্রী যেখানে রয়েছে, কর্মে যাদের প্রবণতা এসে গেছে, তাদের পক্ষে সমগ্র বিদ্যালয়টির নীচের দিকে প্যানেল করা অসম্ভব নয়। বারান্দা ও করিডরেও অনুরূপ প্যানেল থাকতে পারে। তাছাড়া মাঝে মাঝে থাকবে নানা ধরনের আলপনা। অঙ্কনে ভাল ছাত্র-ছাত্রী যদি থাকে তবে ত কথাই নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। আর্টের শিক্ষক চক দিয়ে আলপনা এঁকে দিতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তুলি দিয়ে জল ও গঁদ মেশান গুঁড়ো রঙএর সাহায্যে আলপনাগুলি সম্পূর্ণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় হলে দেওয়ালগুলির উপরের দিকে চারদিকে বড় বড় করে ফ্রেসকো ছবি অঙ্কিত থাকবে। বিদ্যালয়ের আর্ট টিচার ধীরে ধীরে এ কাজগুলো করবেন। হলঘরে বিভিন্ন দেশবিদেশের শিক্ষাবিদ ও দেশের মহান ব্যক্তিদের ফটো টাঙান থাকবে। করিডরেও দুদিকে ফটো থাকবে।

কাঠের জিনিস পালিশ—শ্রেণীকক্ষগুলিতে চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক আছে, আছে কাবার্ড, আলামারী, বোর্ড ইত্যাদি। কাঠের জিনিসগুলি নোংরা হয়ে যায়, পালিশ উঠে যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বৎসর একবার কাঠের জিনিসপত্রের পুরানো পালিশ শিরিষ কাগজ দিয়ে উঠিয়ে নূতন পালিশ লাগিয়ে দেবে। এতে বেশি দিন সময় নষ্ট হবে না। সব ছাত্রছাত্রী কাজে লাগলে

এক রবিবারে সমগ্র কাজটি সম্পূর্ণ হতে পারবে। পালিশ তৈরি করতে বেশি পরিশ্রম লাগবে না। খরচও খুব বেশি নয়। শুধু মেথিলেটেড স্পিরিট ও চাচ মিশিয়েই পালিশ তৈরি করা যায়। নেকড়ার গুলি করে ধীরে ধীরে পালিশে ডুবিয়ে কাঠের জিনিসপত্র পালিশ করা চলতে পারে। বোর্ডে মাঝে মাঝেই শ্লেট রঙ লাগাতে হবে। বোর্ডে দাগ থাকলে লেখা ভাল না পড়লে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হবে।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ছাড়াও অন্যান্য কক্ষ থাকে। গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান কক্ষ, ইতিহাস কক্ষ, ভূগোল কক্ষ, শিক্ষকদের বিশ্রামাগার, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অফিসঘর, গোডাউন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ঘর সাজান থাকবে। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের ঘরে টেবিলে ফুলদানিতে ফুল থাকবে। গ্রন্থাগারও ভালভাবে সাজান থাকবে। চার কোণায় চারটি ছোট টেবিলে থাকবে ফুলদানি ও ফুল।

বেদি ও উদ্যান রচনা—বিদ্যালয় গৃহের বাইরে গাছপালা থাকলে তার নীচে বেদী তৈরী করা যায়, যাতে সেখানে ছাত্রছাত্রী গিয়ে বসতে পারে। বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে থাকবে ফুলের বাগান। ছাত্রছাত্রীরা পরিকল্পিতভাবে উদ্যান রচনা করবে, তাতে থাকবে বিভিন্ন ফুল ও ঋতুকালীন ফুলের চারার সমাবেশ।

সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য সাধনের ইঙ্গিত দেওয়া হল। এখন বিদ্যালয়ের গৃহ ও তার স্থিতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য নানারূপ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ছাত্রছাত্রী সংসদে এ বিষয়ে নানা প্রস্তাব রাখা হবে।

সুন্দর পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের মন থাকবে সুরুচিসম্পন্ন এবং সেই আবেষ্টনীতে শিক্ষাগ্রহণ ফলপ্রসূ হবে।

(ক) চার্ট, মডেল, পোষ্টার, সময়রেখা তৈরি ইত্যাদি

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকালে চার্ট, মডেল, সময়রেখা ইত্যাদি প্রদীপণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এসব প্রদীপণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তৈরি করবে। ছাত্রছাত্রীরা এগুলো তৈরি করতে গিয়ে বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

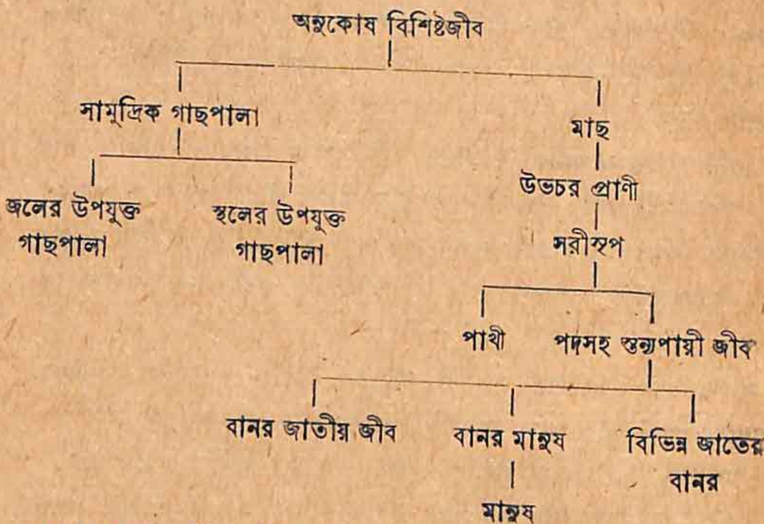
পোষ্টার সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষের কাজে আসবে না। কিন্তু যেহেতু

বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রাম্যসমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেইহেতু ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রচারের জন্য পোষ্টারও তৈরি করবে।

এখন প্রত্যেকটি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

চার্ট—কোনও একটি বিষয় বুঝাবার জন্য অনেক সময় লিখিত চার্টের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক **প্রাণী সৃষ্টি** এই বিষয়টি শ্রেণীতে পড়ান হবে। শিক্ষক ছক কেটে দিলেন। ছাত্রছাত্রীরা বড় মোটা ড্রইং পেপারে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী লিখবে।

প্রাণী সৃষ্টি



যেসব ছাত্র/ছাত্রী চার্ট লিখবে তাদের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা যেমন ছক দেবেন, তেমনি কি Type-এ, কোন কালিতে বা কোন জিনিস দিয়ে লেখা হবে তাও বলে দেবেন।

Type-এর সাইজ হবে Heading	৩ সে,মি,
নীচের লেখাগুলি	১-২৫ ”
কালি	চাইনিজ ইঙ্ক
নিব	কুইল পেন

লেখার সাথে যদি ছবির নির্দেশ দেওয়া থাকে, তাহলে ছবিও অঙ্কিত থাকবে।

যে কোন বিষয়কে ক্ষুদ্র সংস্করণে বা সংক্ষেপিত করে কয়েকটি পয়েন্টে

সন্নিবেশিত করেই চার্ট তৈরি করা যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের এক নজরে জিনিসটি মনে রাখা। এনোফেলিস ও কিউলেক্স মশার তুলনা করণ। প্রজাপতি ও মথের বিভিন্নতা ইত্যাদির Tabular form-এর চার্ট করা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ। চার্ট শুধু ছবির আকারেও হতে পারে। ব্যাঙের জীবনের বিভিন্ন স্তর, জবা ফুলের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি ছবি মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে।

যে জাতীয় চার্টের কথা বলা হল একে বলা হয় Tree Chart। Tree Chart থেকে কোন বিষয়ের বৃদ্ধি বা পরিণতি দেখান হয়। মূল বিষয় থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বের হয়েছে।

Flow chart প্রায় একই রকম, তবে তীর চিহ্ন দিয়ে যেসব জিনিস সংগঠিত তা দেখান হয়। Isotype chart-এ ছবি দ্বারা পরিসংখ্যান অর্থবোধক করা হয়। Pye chart-এ একটি বৃত্তে, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যতগুলি কোণ আবশ্যক ততগুলি কোণে বিভক্ত করা হয় এবং কোণগুলিতে সেগুলি লেখা থাকে। উপরে একটি ঢাকনা থাকে, তা স্ক্রু দিয়ে আঁটা থাকে যাতে ঘোরান চলে। একটি কোণের পরিমাণ স্থান কাটা থাকে। যখন যে অংশ দেখান দরকার, তাই দেখান হয়।

(খ) মডেল বা আদর্শ

শ্রেণীতে শিক্ষাদানকালে মডেল বা আদর্শের প্রয়োজন হয়। মডেল দেখিয়ে পাঠদান করা হলে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিষয়বস্তু থিতিয়ে বসে। যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়া চলে না, সেখানে আদর্শের সাহায্যে পাঠ দিয়ে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম হন। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যদি নিজেরা মডেল তৈরি করে তাহলে তাদের শিক্ষা আরও ব্যাপকতর হয়। এরূপ অসংখ্য মডেল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশে ও সহযোগিতায় অনেক করতে পারে। নদীর গতি, বাঁধ, পাহাড়, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ ইত্যাদি কাজ ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে প্ল্যাষ্টিসিন, কাগজের মণ্ড বা মাটির সাহায্যে করতে পারে।

(গ) পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র

পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র প্রচারের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়। বিদ্যালয়কে

গ্রাম সংযোগ করতে হয়। গ্রাম্য সমাজের প্রতি কোন অনুরোধ বা নির্দেশ জারী করতে হলে প্রচারপত্র আবশ্যক। প্রচারের বিষয়বস্তুর সাথে যদি একটি ছবি থাকে তবে তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বসন্তের টিকা নিন!

ছবি সম্বলিত করে গ্রামের সড়কের ধারে গাছের শাখায় বা বাড়ির প্রাচীরে পোষ্টার লাগান যেতে পারে।

শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে—মা পিছনে দাঁড়িয়ে, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র সাময়িক প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের নির্দেশে তৈরি করতে পারে।

(খ) সময়রেখা

ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সময়রেখা বিশেষ প্রয়োজন। ঘটনা পরম্পরাকে জানার জন্য, সময়রেখার ব্যবহার বিশেষ সাহায্যকারী প্রদীপণ। শিক্ষকের নির্দেশ ছাত্রছাত্রীদের সময়রেখা তৈরি করবে। সময়রেখা নানারকম হতে পারে। আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করে এবং সেভাবে ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে বা অল্প ২।৩ শতাব্দীর জন্য, যেমন গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা, সুলতানী আমল ইত্যাদি। প্রত্যেক রাজার জীবিতকাল উল্লেখ করে এবং জীবনের ঘটনা পরম্পরায় সাজিয়ে সময়রেখা করা যায়। তোমরা ইতিহাসের পুস্তকে সময়রেখার নমুনা দেখতে পাবে। ওখানে বুঝতে পারা যাবে কোন আমল কতটা সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ছবির সাহায্যে সময়রেখা তৈরি করা চলে। যেমন মুঘল আমলের সময়রেখা তৈরি করতে, পাশে সময় নির্দেশ করে সম্রাটদের ছবি এঁকে দেওয়া চলে। ছাত্রছাত্রীরা একাজ আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করবে।

৩। আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যালয়ে আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি জন্য একটি বুলেটিন বোর্ড থাকবে। বুলেটিন বোর্ডের শিক্ষাগত গুরুত্ব খুব বেশি।

বুলেটিন বোর্ডে দিন তারিখ উপরে লিখে, দিনের তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশন করা চলে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ রেডিওর বিজ্ঞপ্তি শুনে বুলেটিন বোর্ডে লিখে দেওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা, পথচারীরা বুলেটিন বোর্ড দেখে সব বিষয়ে জানতে পারবে।

বুলেটিন বোর্ডের পাশেই দুটি স্কোয়ার বোর্ড বা গ্রাফ বোর্ড থাকবে। তাতে সপ্তাহের তাপমাত্রার পরিবর্তনের রেখাচিত্র এবং বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র থাকবে।

বিদ্যালয়ে তাপমান যন্ত্র আছে, বৃষ্টিমাপক যন্ত্রও আছে। ছাত্রছাত্রীরা ঐ যন্ত্রগুলি থেকে হিসাব করে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ বের করে রেখাচিত্র অঙ্কন করবে। শিক্ষকের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪। সংবাদ পরিবেশনের জন্য বোর্ড

সংবাদ পরিবেশনের জন্য তিনটি বোর্ড থাকবে। একটিতে থাকবে স্থানীয় খবর। আর একটিতে ভারতীয় খবর এবং আর একটিতে বিদেশী খবর। খেলার খবরের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সমান ঔৎসুক্য। অতএব সে সব খবর থাকবেই।

৫। বিদ্যালয় পরিষ্করণ। (এ বিষয়ে আমরা সমাজসেবার প্রথম ভাগের ৩নং অংশে বিশদভাবে আলোচনা করেছি)।

৬। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

বিদ্যালয় ও গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে থাকে। অতএব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করান একান্তই প্রয়োজনীয়। ছাত্রছাত্রীরা গ্রাম বা গ্রামান্তর থেকেই ত আসে, তারা সব কিছুই দেখতে পায়। তবু তাদের দিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ হবে নিয়ন্ত্রিত। ছাত্রছাত্রীরা আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের কাজে তারা ইঙ্গিত নেবে শিক্ষকের কাছে।

ছাত্রছাত্রীদের পর্যবেক্ষণে বের হবার পূর্বে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের একটি জিজ্ঞাসাপত্র বা Questionnaire দিয়ে দেবেন। Quesstionnaire এ বিভিন্ন বিভাগ থাকবে এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখবে। Questionnaire দেবার কারণ হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা কি পর্যবেক্ষণ করবে, তার ইঙ্গিত। গ্রামের কোথায় গাছপালা, কী জাতীয় গাছপালা, খাল, বিল, মাঠ, পুকুর, নদী ইত্যাদি তারা পর্যবেক্ষণ করবে। প্রত্যেকটি জিনিসের কিছু বৈশিষ্ট্য যা থাকবে তা তারা লক্ষ্য করে দেখবে।

এরূপ পর্যবেক্ষণের কাজের জন্য শীতকালই উপযুক্ত সময়। কারণ ঘোরাঘুরিতে ছাত্রীছাত্রীদের ক্লান্তি আসবে না। কিন্তু প্রকৃতির সামগ্রিক রূপও শুধু শীতকালে পাওয়া যাবে না। তাই বৎসরের অন্যান্য সময়ে এমন কি বর্ষাকালেও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্রছাত্রারা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নানা জিনিস সংগ্রহ করবে। যথা, বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা-ত আনবেই, তাছাড়া আনবে মাটির নমুনা, বীজের নমুনা ইত্যাদি, আনবে পাখির বাসা, পাখির ডিম, বেঙাচি, বেঙের রূপান্তরের নানা নমুনা, ছোট মাছ, প্রজাপতি, শুয়াপোকা, পিঁপড়া, পিঁপড়ার বাসা ইত্যাদি।

ছাত্রছাত্রীরা যা সংগ্রহ করে আনবে, তা তারা 'প্রকৃতি কোণে' (Nature Corner) এ সাজিয়ে রাখবে। তারা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ পুস্তক রচনা করবে। কাজটি হবে দলীয়, ও সম্মিলিত। পর্যবেক্ষণের পর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দলীয় আলোচনা হবে, শিক্ষক আলোচনা পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন দলের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহ একই রকম সাইজের কাগজে লিখিত (এ্যালবামের সাইজ) থাকবে। লেখা হবে একটি নির্দিষ্ট সাইজের অক্ষরে। ৪ মিমি. লেখা ও ৫ মিমি. ফাঁকে লেখা হলে লেখা সুন্দর হবে এবং রক্ষণ করে রাখবার মত একটি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

তারপর সংগৃহীত লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদিও এ্যালবামে রাখতে হবে। এগুলি রাখবারও একটি নিয়ম আছে। এগুলি ব্লটিং পেপারের চাপে ২।৩ দিন রেখে পাতা, ফুল ইত্যাদির রস বের করে ফেলতে হবে, তারপর সেগুলি শ্রেণী বিভক্ত করে এ্যালবামের পাতায় সেগুলি রেখে সেলোটাপের ফিতার টুকরো দিয়ে আটকে দিতে হবে। লিখিত রিপোর্টের মধ্যে সেগুলির উল্লেখ থাকবে। পাখির পালক, বাসা, ডিম, পিঁপড়ার বাসা, ডিম ইত্যাদিও উপযুক্ত আধারে

রেখে তার সাথে নাম লিখে রাখতে হবে। বেঙের রূপান্তরের বিভিন্ন অবস্থা যা সংগৃহীত হবে তাও উপযুক্ত স্থানে রেখে তার ছবি এঁকে সাজিয়ে রাখতে হবে। ছোট ছোট মাছ বোতলে জল দিয়ে তাতে রাখা যাবে। বিভিন্ন ফসলের বীজ বিভিন্ন বোতলে রেখে লেবেল লাগিয়ে সাজিয়ে রাখা চলবে। যত রকমের মাটি পাওয়া যায় উপযুক্ত আধারে রেখে সাজিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে বস্তু দেখেছে এবং তাদের অবলম্বনে যে সব জিনিস সংগ্রহ করে এনেছে, তা সংরক্ষণ করতে হবে, তাহলেই একটি 'প্রকৃতিপুস্তক' ও 'প্রকৃতি কোণ', গড়ে উঠতে পারবে।

৭। বিদ্যালয়ে Common room পরিচালনা

প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একটি Common room থাকা উচিত। Common room বলতে এমন একটি ঘর যেখানে ছাত্রগণ গিয়ে অবসর সময় বসবে এবং তা এমন হবে যা ছাত্রদের বৌদ্ধিক, শারীরিক ও নৈতিক বিকাশের সহায়ক হয়। Common room এ ছাত্রছাত্রী ঘরের ভিতরে বিভিন্ন সামগ্রীর সাহায্যে খেলবে, যথা—লুডো, টেবিল টেনিস বাগাটেলি ইত্যাদি, এবং দৈনিক, পাক্ষিক, ও মাসিক পত্রিকা পড়বে। বলা বাহুল্য এসব পুস্তকাদি ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত হবে। Common room পরিচালনার ভার গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের উপরই দিতে হবে। একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অবশ্য এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবেন।

পাঠচক্র বা Study group ও বিদ্যালয়ে গঠন করা যায়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা এই সমিতির সভ্য হয়ে অবসর সময়ে পাঠ করবে। তার জন্য পুস্তক থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাগার থেকে এই জন্য পুস্তক ধার করে আনা হবে।

৮। বিদ্যালয়ে আর একটি সংস্থা থাকবে যার সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনা করবে। সেগুলো হচ্ছে নাটকাভিনয়, বিতর্কসভা, বক্তৃতা অভ্যাস আবৃত্তি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি অনুশীলনের মধ্যে যেমন তৃপ্তি থাকে, তেমনি ঐগুলি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে সাহায্য করে। প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি থাকবে এবং তারাই

সেসব পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে। নাটকাভিনয়ের সমিতি বৎসরে উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করবে, নাটক বাছাই করবে, নাটকে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের স্থির করবে, তাদের দিয়ে মহড়া দেওয়ান হবে ইত্যাদি। অভিনয় সমিতি নাটকাভিনয়ের জন্য সাজ-পোশাক, সিন-সিনারি ইত্যাদি তৈরি করবে। এ দায়িত্ব যে শুধু তাদেরই এমন কিছু কথা নেই, এই দায়িত্ব সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের।

বিতর্কসভা পরিচালনার জন্যও একটি সমিতি থাকবে। এই সমিতি স্থির করবে কোন বিষয়ের উপর বিতর্কসভা বসবে। কারা প্রস্তাবের সমর্থন বা বিরোধিতা করবে তাও আগে থেকেই স্থির করা থাকবে। তবে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা যে কোন মতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করবার সুযোগ পাবেন। বিতর্কসভা পরিচালনা করবেন কোন শিক্ষক বা সমাজের কোন অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তি। তাঁকে বিতর্কসভায় আমন্ত্রণ জানান যেতে পারে বিতর্কসভার শেষে প্রস্তাবের সমর্থনে ও বিরোধিতায় ভোট নওয়া হবে। সবশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁর নিজস্ব মন্তব্য সমবেত উপস্থিত মণ্ডলীর কাছে রাখবেন।

বিতর্ক সভার মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব বক্তব্য রাখতে শিখবে।

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী আবৃত্তি গান ইত্যাদি করে থাকে। এর জন্য শ্রেণীতে যে সব কবিতা পাঠদান করা হয় সেগুলি আবৃত্তি করতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে বৎসরে একবার সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অঙ্কন প্রতিযোগিতাও বৎসরে একবার হবে। সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যও একটি নির্ধারিত সংস্থা থাকবে। তাঁরাই এসবের যথাসময়ে ব্যবস্থা করবে।

৯। মডেল ও রিলিফ মানচিত্র তৈরী

মডেল কিভাবে তৈরি করা যাবে তার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

এখানে রিলিফ মানচিত্র কিভাবে তৈরি করতে শেখান হবে, তার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। রিলিফ মানচিত্রে উচ্চতা অনুযায়ী মসলার স্তর লাগাতে

হবে। মসলা দুরকমের হতে পারে, একটি হচ্ছে পুটি, অপরটি হচ্ছে কাগজের মণ্ড।

পুটি তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে, চকের গুঁড়োর সাথে তিসির তেল মিশিয়ে খুব ভাল করে মেখে হাতুড়ি বা ম্যালেট দিয়ে তা পেটাতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে পেটালে জিনিসটি নরম হবে, কিন্তু ঐ জিনিসটি পরে খুব শক্ত হয়ে যায়।

কাগজের মণ্ড বা Papier mache তৈরি করবার নিয়ম হচ্ছে, ফেলে দেওয়া খবরের কাগজ খুব ছোট ছোট টুকরোতে পরিণত করতে হয়, তারপরে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। প্রায় ৪০ ঘণ্টা ভেজালেই ঐগুলো খুব নরম হয়ে যাবে। পরে ঐগুলো জল থেকে তুলে খুব কচলে জল নিংড়ে ফেলতে হয়। হাত দিয়ে ডলতে ডলতে জিনিসটি একটি নরম জিনিসে পরিণত হবে। তখন তার সাথে গঁদের আটা মেশাতে হয়। তারপর পুটি তৈরি করবার মত ঐ জিনিসকে ভাল করে মেখে কাঠের ম্যালেট দিয়ে কিংবা হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে হয়। অনেকক্ষণ পেটানোর পর একটি চটচটে জিনিসের সৃষ্টি হবে। এটাই Papier mache বা কাগজের মণ্ড।

রিলিফ মানচিত্র তৈরি করতে কাগজের মণ্ড বা পুটি দুইটি জিনিসই খুব উপযুক্ত। দুটোই শুকিয়ে গেলে খুব শক্ত হয়।

রিলিফ মানচিত্র তৈরি করবার নিয়ম—একটি কাঠের ট্রে সাইজ ৬০ সেমি. × ৪৫ সেমি. পিস পাইন দিয়ে তৈরি করে নাও। কাঠটি যাতে প্লেন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের একটি রিলিফ মানচিত্র তৈরি করতে হবে। ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সাধারণ কাগজের পশ্চিমবঙ্গের wall map থেকে তুলে তারপর কার্বন পেপারের সাহায্যে ট্রে-এর কাঠের উপর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটি অঙ্কন কর।

আমাদের জানা আছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে হিমালয় পর্বত, তার পাদদেশে উচ্চ টেরাই অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে সমতলভূমি, দক্ষিণাংশে জমি আরও নীচু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। সমুদ্রের উত্তরে সুন্দর বন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে উঁচু ভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্থানগুলির উচ্চতা আমরা ভূগোলের পাতা খুললেই জানতে পারব। রিলিফ মানচিত্রে, হিমালয়ের শিখরদেশের উচ্চতা ৩ সেমি. ধরে উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে ২ সেমি. থেকে সুরু করে টেরাইতে ১ সেমিতে নিয়ে আস এবং উচ্চতা অনুযায়ী ৩ সেমি ২ সেমি ১ সেমি পেরেক পুতে যাও।

উত্তরের জায়গাগুলি ৫ মিমি পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের মানচিত্র ১ সেমি. পেরেক লাগাও। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাঞ্চলে পেরেক লাগাতে হবে না। এবার পেরক অনুযায়ী উঁচু করে পুটি বা কাগজের মণ্ড লাগিয়ে প্রলেপ দাও। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে ২ মিমি. উচ্চতা ও দক্ষিণাঞ্চলে ½ মিমি. উচ্চতা রক্ষা করা পুটি বা কাগজের মণ্ডের প্রলেপ দিয়ে যাও। মণ্ড বা পুটি সমগ্র মানচিত্রটি ঘিরে হবে। শুকিয়ে যেতে ২ দিন সময় যাবে। এদিকে পুটি বা মণ্ডের চাপে পেরেকগুলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শুকিয়ে গেলে ২½ সেমি. পেইন্ট ব্রাস দিয়ে গঁদ মেশান গুঁড়ো রঙ রিলিফ মানচিত্রে লাগাও। বিভিন্ন উচ্চতায় কোথায় কি রঙ থাকে তার হদিশ পাওয়া যাবে Physical map-এ। সেই অনুসারে রিলিফ মানচিত্রে রঙ লাগিয়ে যাও। নদীগুলির কোন উচ্চতা থাকবে না। সমুদ্রের উচ্চতা নেই। রঙ নীল। এভাবে রঙ দেওয়া হলে শুকোবার পরে মানচিত্রে স্থানে স্থানে ছাপান নাম কেটে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে লাগিয়ে দাও। তারপর লাগাও পেপার ভার্নিস। সুন্দর রিলিফ মানাচত্র হয়ে গেল।

১০। বিদ্যালয়ের পত্রিকা

বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশন ব্যবস্থা প্রচলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাদির মধ্যে এর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্রপত্রিকা প্রকাশনের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃজনাত্মক কর্মাবলীর প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে মাত্র একটি বাৎসরিক বা ষান্মাসিক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা হলে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকেই তার আত্মপ্রকাশনের ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তাই প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশনের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর একজন করে নির্ধারিত পত্রিকা সম্পাদক থাকবে এবং সাথে থাকবে নির্বাচিত উপদেষ্টাবর্গ। সম্পাদক ও উপদেষ্টাবর্গ উৎসাহী হয়ে প্রত্যেক মাসের জন্য একটি দেওয়াল পত্রিকা (হস্তলিখিত) প্রকাশ করবে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে একটি বুলেটিন বোর্ড থাকবে, সেখানেই টাঙান থাকবে দেওয়াল পত্রিকাটি। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী থেকে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে এবং শ্রেণী শিক্ষকের সহযোগিতায় রচনাগুলি সংশোধন করে একটি বড় কাগজের সিটে সুন্দর করে লিখবার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের হাতের লেখা সুন্দর তাদের লেখার কাজে

লাগাতে হবে। কাগজখানার চতুর্দিক সুন্দর অঙ্কন দ্বারা সজ্জিত থাকবে। যারা অঙ্কনে দক্ষ তারা করবে এ কাজ। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাতে বৎসরে একবার লেখার সুযোগ পায় তা দেখতে হবে। কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হবে না। ঐ জন্যই শ্রেণী শিক্ষকের দ্বারা রচনা সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত হলেও নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীর রচনাত বটেই। নিজস্ব ভাব প্রকাশন ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীকে আরও বেশি কাজে উদ্বুদ্ধ করবে একথা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক সম্পাদকীয় লিখবে, সেক্ষেত্রে শ্রেণী-শিক্ষক অবশ্যই সম্পাদককে নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করবেন।

দেওয়াল পত্রিকা ব্যতীত সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি ছাপা পত্রিকার ব্যবস্থাও থাকবে। বৎসরে একবার কিংবা দুবার পত্রিকাটি বের হবে। এর জন্য সমগ্র বিদ্যালয়ের ভিত্তিতে রচনা সংগ্রহ করতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সম্পাদকত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে থাকবেই, তাছাড়া উপদেষ্টা সমিতিও থাকবে। তারাও হবে নির্ধারিত। তাছাড়া প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন শিক্ষক পত্রিকার উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। রচনাগুলি সংগৃহীত হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ সেগুলি ভাল করে দেখবেন এবং নির্বাচন করবেন। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর দেওয়াল পত্রিকা থেকেও ভাল প্রবন্ধ বা কবিতা বা গল্প ছাপা পত্রিকার জন্য সংগৃহীত হবে। সম্পাদকীয় লিখতে সম্পাদক প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন মনোনীত শিক্ষকের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করবে।

ছাপা পত্রিকাতে বাইরের সাথে অর্থাৎ গ্রামসংযোগের কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সম্বন্ধেও রিপোর্ট লিখিত থাকবে। গ্রামবাসীদের পত্রিকা দিতে হবে এবং তাঁদের কাছেও প্রবন্ধ বা কবিতার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। গ্রামের সাথে বিদ্যালয়ের যত যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

১১। শ্রেণী গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ে ত একটি গ্রন্থাগার থাকবেই, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে। শ্রেণীর মান ও প্রয়োজন অনুযায়ী reference বই ও অন্যান্য বই শ্রেণী গ্রন্থাগারে থাকবে। এই

পুস্তকগুলি সরবরাহ করবে বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। শ্রেণীতে একটি গ্রন্থাগার থাকলে ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের বই পড়বার সুযোগ পাবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই নিতে অনেকে যেতে চায় না, কিন্তু শ্রেণীতে সে সুবিধা থাকলে ছাত্রছাত্রীদের আর বই পড়তে আপত্তি থাকবে না। গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়ার অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে গঠিত হবে।

১২। বিদ্যালয়ের যাদুঘর বা সংগ্রহশালা

বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীতে একটি (প্রকৃতি কোণ) তৈরি করে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টাতেই সেই প্রকৃত কোণটি গড়ে উঠেছে। প্রকৃতি কোণ তৈরি করতে গিয়ে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নানা জিনিস হয়ত সংগ্রহ করেছে। তারা হয়ত বহু পুরাতন ইট, কাঠ পাথর, ছবি, মুদ্রা, কোনও মডেল, পুরাতন মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। এসব জিনিস বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় যাদুঘরে থাকবে। তাছাড়া 'প্রকৃতি কোণ' থেকে নানা জিনিস আসবে কেন্দ্রীয় যাদুঘরে। সংগৃহীত জিনিস তার নাম, পরিচয়, কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তার ইতিবৃত্ত, কে সংগ্রহ করেছে তার নাম ইত্যাদি সব জিনিসপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। বিদ্যালয়ের যাদুঘর একদিনেই গড়ে উঠবে না। দীর্ঘদিনের সকলের অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের প্রচেষ্টাতেই সংগ্রহশালাটি উপযুক্ত শিক্ষাক্ষেত্ররূপে মর্যাদা পেতে পারবে।